জীবন জাগার গল্প ১০

গুরফাতাম মিন হায়াত

মুহাম্মাদ আতীক উল্লাহ

গুরফাতাম মিন হায়াত

[জীবন জাগার গল্প-১০]

মুহাম্মাদ আতীকুল্লাহ

শিক্ষক

তারজামাতু মা'আনিল কুরআন, সীরাত, ইতিহাস

মাদরাসাতুল কুরআনিল কারীম

শ্যামলী, ঢাকা

উৎসর্গ

ফিলিস্তিনী মেয়েরা সাধারণতঃ আধুনিক 'হিজাব' পরতে অভ্যস্ত! কিন্তু 'হুদাইল সালাহ হাশলামুন' ছিল ব্যতিক্রম! পুরোপুরি খাস পর্দা করা মেয়ে! মেয়েটা কিভাবে যে ইসরাইলি জানোয়ারটার অস্ত্রের মুখে নির্ভীকভাবে দাঁড়িয়ে ছিল?

এই অসীম সাহসী আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন বোনটির মাকবুল শাহাদাত কামনায়।

শুরুর কথা

গল্প এখন আর নিছক গল্প নেই। নিজের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার হয়ে উঠেছে! যারাই কিছু বলতে চায়, নিজেদের কোনও মত প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তারা প্রথমে একটা গল্প তৈরী করে। ভালো হলে, সত্য গল্প তৈরী করে। মন্দ হলে, মিথ্যে গল্প ফাঁদে।

♣

জনমনে একটা ধারণা বেশ পাকাপোক্ত হয়েই আসন-পিঁড়ি হয়ে বসেছে, গল্প লেখা মানেই 'সাহিত্যচর্চা' করা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, একদল গল্পের বই পড়েই সাহিত্য শেখার 'দূরাশা' নিয়ে।

♣

'গল্পবলিয়ে' দাদু যখন কাঁথামুড়ি দিয়ে নাতি-নাতকুকে জমাটি গল্প বলে, তখন কি তিনি সাহিত্যচর্চায় 'নিরত রহিয়াছেন'? নাকি সাহিত্য 'বোদ্ধারা' নিজ থেকে সেটাকে 'সাহিত্যচর্চা' বলে আখ্যা দিচ্ছেন?

♣

কারো কারো এমন প্রবণতা আছে একটা বই খুলেই সেটার ভাষার মান, সাহিত্যমান খুঁজতে লেগে যায়! কিছু বই থাক না নিক্তি-পাল্লার বাইরে! কিছু গল্প থাক না, সাহিত্যচর্চার আওতামুক্ত হয়ে!

♣

বৃষ্টির দিনে টিনের ঘরে বসে, মুড়িভাজা খেতে বেশ লাগে! চালভাজাও মন্দ নয়। খিচুড়ি হলে তো কথাই নেই। কুড়মুড়ে বাদামভাজা থাকলে, জানলার ধারে বসে, দানাটা মুখে পুরে খোসাগুলো পানিতে ভাসিয়ে দেয়ার মাঝে এক ধরনের শিশুসুলভ আনন্দ আছে। এর পাশাপাশি যদি গল্প শোনার ব্যবস্থা থাকে কেমন হয়?

♣

উৎসব-আনন্দে সবাই একসাথ হয়েছে। বাড়ির উঠোনে বা নিরালা ছাদে সবই একজোট হয়ে বসেছে! তখন রসকষহীন কিছু চলে? উঁহু! গল্প ছাড়া আর কী! খেয়াল করলে দেখা যাবে, প্রায় সবারই কিছু না কিছু বলার থাকে! সংসারের

গল্প, কর্মস্থলের গল্প! এমনকি ছেলেবেলায় ফেলে আসা সবার যৌথগল্পও নতুন করে উঠে আসে!

♣

গল্প-উপন্যাস মানেই 'প্রেম'! এমন একটা বিচ্যুত চিন্তা কিছু মানুষের মন-মগজে চেপে বসে আছে! এই ধারাটা ভাঙা দরকার! এই গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসার দরকার! পাঠক-লেখক কেউই এর দায় এড়াতে পারেন না। লেখককুলকে ভাবতে হবে, গুনাহমুক্ত গল্প কিভাবে বলা যায়! পাঠককে ভাবতে হবে গুনাহমুক্ত লেখা কিভাবে নিজের কাছে প্রিয় করে তোলা যায়!

♣

সবচেয়ে সুন্দর করে গল্প বলতে পারেন কে?

প্রশ্নটা পড়ার পর, সাথে সাথে কার মাথায় কোন উত্তর এসেছে? কেউ কেউ হয়তো নিজের প্রিয় লেখকের কথাই মাথায় ঘুরপাক খাওয়াচ্ছে! সবচেয়ে সুন্দর গল্প কে বলতে পারেন, এটা নিয়ে ভাবনার কোনও ধরনের অবকাশ আছে বলে মনেই হয় না। এটার ফয়সালা সেই শত শত বছর আগেই আল্লাহই দিয়ে দিয়েছেন।

-আমি আপনাকে সুন্দরতম গল্প শোনাতে যাচ্ছি!

আল্লাহ তা'আলা যেখানে নিজেই দাবী করেছেন, তবে আর কথা কি!

♣

তাহলে গল্প শোনানো, আল্লাহওয়ালা কাজ! চমকে ওঠার কারণ নেই। তাই বলে আগড়ম বাগড়ম কেসসা-কাহিনী নয়! ভালো এবং শিক্ষণীয় গল্প হতে হবে। উৎসাহের গল্প হতে হবে। প্রেরণার গল্প হতে হবে। সেই সাথে আকর্ষণীয়ও হতে হবে! ইউসুফ আ.-এর গল্প কার না শুনতে ইচ্ছে করে? আর গল্প বলার 'ধাঁচ'টাও দেখতে হবে, রাব্বে কারীম কিভাবে গল্পটা উপস্থাপন করেছেন!

সূচিপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

জীবন জাগার গল্প: ৫৮২

মায়ের সেবা!

ডাক্তার চেম্বারে রোগী দেখছেন। একের পর এক রোগী আসছে, ব্যবস্থাপত্র নিয়ে চলে যাচ্ছে। সবার শেষে এক এক বৃদ্ধা মহিলা এলেন। সাথে ত্রিশ ছুঁই ছুঁই এক টগবগে যুবা। ডাক্তার একটা বিষয় লক্ষ্য করলেন, বৃদ্ধার প্রতি যুবকের অস্বাভাবিক মমতা প্রতিটি আচরণে প্রকাশ পাচ্ছে। বৃদ্ধার নড়াচড়া দেখে বোঝা যাচ্ছিল তিনি মানসিকভাবে সুস্থ নন। অপ্রকৃতিস্থ ঘোলাটে দৃষ্টিই সেটা বলে দিচ্ছিল। ডাক্তার রুগী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্যাবলী জানতে ব্রতী হলেন। পেশাগত সীমার বাইরে বাড়তি কৌতূহল অনুভব করছিলেন।

-রোগী তো সম্পর্কে আপনার মা?

-জি।

-সার্বক্ষণিক দেখাশোনা কে করেন?

-আমিই করার চেষ্টা করি!

-একান্ত প্রয়োজনীয় সেবাগুলো?

-যতদূর সাধ্যে কুলোয় আমিই সেদিকটা সামলানোর চেষ্টা করি। গোসলখানায় আগে গিয়ে সবকিছু ঠিকঠাক করে দিয়ে আসি। কাপড়-সাবান হাতের নাগালে রাখি! বালতিতে পানি ভর্তি করে মগটা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে আসি।

-একজন পরিচারিকা রাখলেই তো এদিকটার সহজ একটা সমাধান বের হয়ে আসে!

-সেটা করতে কসুর করিনি। কিন্তু আম্মার আচরণ মাঝেমধ্যে একদম শিশুসুলভ হয়ে পড়ে। কখনো কখনো অন্যদের ওপর ক্ষেপে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ডও ঘটিয়ে ফেলেন। বাইরের মানুষকে টাকা দিলেও আম্মুর বিপজ্জনক আচরণগুলো তারা সহ্য করে নিতে পারে না। কেউ ভয়ে পালিয়ে যায়। কেউ

ঘৃণায়। শেষে বাধ্য হয়ে দায়িত্বটা নিজের কাঁধেই তুলে নিয়েছি। আর এক পরিচারিকা মাকে ভীষণ কষ্ট দিয়ে ফেলেছিল। মায়ের অসুস্থতা আরও বেড়ে গিয়েছিল ওই দুষ্ট মানুষটার নীরব নির্যাতনে। আমার সামনে খুবই যত্নআত্তি করতো। পেছন হলেই সে আসল রূপে আবির্ভূত হতো। ভাগ্যক্রমে বিষয়টা চোখে পড়েছিল। ঘটনাটা ছিল বিয়ের আগের।

-ও, আপনি বিয়েও করেছেন?

-জি।

-আপনার স্ত্রীও দেখাশোনা করতে পারে!

-জি। সেও সাধ্যমতো করে। সে রান্নাবান্নার কাজগুলো দেখে। আমাদের দু'টি বাচ্চা আছে। তাদের দেখাশোনা করে। আম্মুর ওষুধপথ্য গুছিয়ে রাখে। কিন্তু আম্মুর একান্ত কাজগুলো আমাকেই দেখতে হয়। কারণ আম্মু মঝেমধ্যে পুত্রবধূকেও সহ্য করতে পারেন না। আমার স্ত্রী ভয়ে কাছে যেতে পারে না। শেষে সংসার ভাঙার উপক্রম হয়েছিল। এবারও আমি অগ্রণী হয়ে তাকে আড়ালে নিয়ে গেলাম। আমাদের ঘরটাকে দুই ভাগ করে নিলাম। একভাগে বউ-বাচ্চারা থাকে। আরেক ভাগে আমি আর মা থাকি। আলাদা হলেও খাওয়া-দাওয়া সব একসাথে হয়। ওঠাবসা একসাথে হয়।

আমার স্ত্রী প্রথম প্রথম চেষ্টা করেছিল। কিন্তু মায়ের সাথে বনিবনা হয়নি। তারপরও সে দূর থেকে যতদূর সম্ভব আমার কাজগুলো গুছিয়ে দেয়। মায়ের জন্যে বিশেষ খাবার যত্ন করে রান্না করে।

-আমরা যে এত কথা বলছি, তিনি কি বুঝতে পারছেন?

-বেশির ভাগই সময়ই তিনি আশেপাশের কথা শুনতে পান না। অথবা বলা যায় তিনি ঘটনাস্থলে বেশির ভাগ সময়ই উপস্থিত থাকেন না। একটা ঘোরের মধ্যে থাকেন।

-তার হাতের নখগুলো দেখছি সদ্য কাটা হয়েছে! এগুলো কে কেটে দেয়?

-জি আমিই কেটে দিই। অসুস্থতার প্রথম পর্যায়ে এসব কাজ তিনি নিজেই করতেন। পরের দিকে পুরোপুরি হালছাড়া হয়ে গেছেন।

-আপনার আর কোনও ভাইবোন নেই?

-জি না।

-রোগের শুরুটা কিভাবে হল?

-বিয়ের আগে থেকেই আব্বু বিদেশে থাকতেন। দাদা-দাদুর পীড়াপীড়িতে বিয়ে করতে দেশে এসেছিলেন। বেশ কিছুদিন ছিলেনও। বিয়ের পর আবার চলে গিয়েছিলেন। আর ফেরেননি। আব্বু আসলে বাড়িতে না জানিয়ে সেখানেই বিয়ে করে ফেলেছিলেন। বাবা-মায়ের কাছে খুলে বলতে পারেননি। আমার জন্মের ছয়মাসের মাথায় দাদা-দাদু আরেক জনের মারফতে জানতে পেরেছিলেন বাবার বিয়ের কথা। এমনকি আর কখনো এদেশে না ফেরার কথা। এই ধাক্কায় দাদাভাই শয্যাশায়ী হলেন। এবং আর সেরে উঠলেন না। দাদাভাইয়ের ইন্তেকালের পর আম্মুও দিনদিন কেমন যেন হয়ে যেতে লাগলেন। দাদু সংসারের হাল ধরলেন। আর্থিক অবস্থা খারাপ ছিল না। পুত্রবধূ আর নাতি দু'জনকেই আগলে রাখলেন। আমি বুঝ হওয়ার পর থেকেই দেখতে পাচ্ছি, আম্মু অসুস্থ। ভাগ্যিস, আমার লেখাপড়া শেষ করা পর্যন্ত দাদু বেঁচে ছিলেন। আমি কর্মজীবনে প্রবেশ করার কিছুদিন পর, আমাকে বিয়ে করিয়ে দেয়ার অল্প ক'দিন পরই দাদু ইন্তেকাল করেন। যেন এতদিন অপেক্ষাতেই ছিলেন। আম্মুর দেখাশোনার ভার আমার হাতে ন্যস্ত করে ওপারে পাড়ি জমালেন।

দাদুর মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করতো। তিনি স্কুলজীবনের বান্ধবীর মেয়েকে বড় আবদার করে, বড় মুখে পুত্রবধূ করে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু মায়ের পেটের ছেলে তাকে এতবড় দাগা দিবে কল্পনা করতে পারেননি। সেজন্য দাদু আজীবন আমার অসুস্থ আম্মুর সেবা করে গেছেন। মনপ্রাণ সঁপে। আমি এখন যা করছি সবই দাদুর দেখাদেখি শিখেছি। দুঃখিত ডাক্তার সাহেব! বেশি কথা বলে ফেলেছি।

-না না, আমি খুব আগ্রহ করেই শুনছি। আজ আর কোন রোগীও বাকি নেই। আচ্ছা শেষ একটা প্রশ্ন করি, আপনি এভাবে একজন প্রায় অচল মানুষের সেবা করতে গিয়ে কখনো বিরক্ত বোধ করেননি?

-জি না। আম্মু দুর্লভ কোনও মুহূর্তে, স্বাভাবিক হয়ে ওঠেন। বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না এমন স্বর্ণালী মুহূর্ত। আমাকে স্বাভাবিক গলায় ডাকেন। কাছে বসিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। তখন মনে হয়, আরও হাজার বছরও যদি মা এমন অসুস্থ থাকেন আমি তার সেবা করে যেতে পারবো!

আরও অবাক করা কিছু মুহূর্তও আসে। মাঝেমধ্যে দেখি, আম্মু হঠাৎ হঠাৎ তার দুই নাতি-নাতনিকে কোলে বসিয়ে অঝোরে কাঁদছেন আর তাদের মাথায়

গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। প্রথম প্রথম আমার স্ত্রী ভয় পেত। এমনকি বাচ্চারাও। এখন সেটা কেটে গেছে!

-যাক, আপনার মায়ের সবকিছু আমি লিখে রেখেছি! ডাক্তারদের বোর্ডে বিষয়টা আমি তুলে ধরবো! আশা করি একটা সুন্দর সমাধান বেরিয়ে আসবে!

-জি ইনশাআল্লাহ।

জীবন জাগার গল্পঃ ৫৮৩

মিশরীয় সামুরাই!

পরীক্ষার খাতায় প্রায় প্রতি বছরই একটা প্রশ্ন থাকে,

-তুমি রাশওয়ানের স্থানে থাকলে কী করতে?

জাপানের স্কুল কারিকুলামের প্রাথমিক ও মাধ্যমিকে একজন ব্যক্তি সম্পর্কে পড়তে হতো, মুহাম্মাদ আলি রাশওয়ান। মানুষটা মিশরের। কিন্তু জাপানের পাঠ্যবইয়ে কিভাবে গেল?

১৯৮৪ সাল। এবার লসএঞ্জেলসে বসেছে অলিম্পিকের আসর। জুডোর ফাইনাল খেলবে দুইজন,

জাপানের ইয়াসুহিরো ইয়ামাশীতা।

মিশরের মুহাম্মাদ আলী রাশওয়ান।

পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কে চ্যাম্পিয়ন হবে সেটা আগাম বলে দেয়া যেত। কিন্তু আগের খেলায় জাপানী ইয়াসুহিরো ডানপায়ে মারাত্মক চোট পেয়েছিল। হাঁটতেই কষ্ট হচ্ছে. সবাই নিষেধ করলেও সে ঠিক করলো ভাঙা পা নিয়েই লড়ে দেখবে। তার হারানোর কিছু নেই। জিতলে স্বর্ণ, হারলে রৌপ্য।

মিশরীয় রাশওয়ানের প্রশিক্ষক ছিল একজন জাপানী। তিনি বেশ আশাবাদী হয়ে উঠলেন। তার ছাত্র এবার স্বর্ণ পেতে যাচ্ছে। আগামীকালের লড়াইয়ের একটা কৌশলও মনে মনে ভেজে ফেললেন। মনের খসড়াকে চূড়ান্ত রূপ দিতেই শিষ্যের সাথে বসলেন।

-আগামীকাল তোমার কাজ একদম সহজ! সমস্ত মনোযোগ প্রতিপক্ষের ডান পায়ে নিবদ্ধ রাখবে। ডান পা'কে ঘিরেই প্যাঁচ কষবে।

রাশওয়ান প্রশিক্ষকের সাথে একমত হলেন না। পরবর্তীতে এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেছিলেন,

-ওস্তাদের কথা শুনে গভীর ভাবনায় পড়ে গেলাম। তিনি তো অন্যায় কিছু বলছেন না। যুদ্ধ জয়ে কৌশল অবলম্বন করতেই হয়। প্রতিপক্ষের দুর্বল স্থানে আঘাত করাই যুদ্ধ জয়ের অন্যতম শর্ত। কিন্তু মনটা কেন যেন সায় দিল না। চিন্তা করে দেখলাম, প্রতিপক্ষের দুর্বলতাটা তো স্বাভাবিক নয়। সাময়িক। সে পরিস্থিতির শিকার। আমি সুযোগের সদ্ব্যবহার করবো?

না তা হতে পারে না। নিজের কাছেই ছোট হয়ে যাবো। ইয়াসুহিরোর ডান পায়ে আঘাত করে জিতলে কি আমার যোগ্যতা প্রমাণ হবে? সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে গেল,

= আমি তার ডান পায়ের দিকে ফিরেও তাকাব না। এতে জিতলে পারলে ভাল, নইলে রৌপ্য পদকই সই। অপরের অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে জেতায় কোনও বীরত্ব নেই। পৌরুষ নেই।

ইয়াসুহিরো ছিলো সত্যিকার বীর। বিশ্বসেরা একজন জুডোশিয়ান। ভাঙা পা নিয়েও জেতার যোগ্যতা রাখেন। পরদিন লড়াই শুরু হলো। জাপানী সামুরই পা লেঙচে লেঙচে এরেনায় এলেন।

রাশওয়ান তার কৃত প্রতিজ্ঞা রক্ষা করলেন। ফলশ্রুতিতে তিনি হেরে গেলেন। পদক প্রদান অনুষ্ঠানে ইয়াসুহিরো নিজেই এগিয়ে গিয়ে রাশওয়ানকে জড়িয়ে ধরে সংবর্ধিত করলেন। হাত উঁচিয়ে সম্মান দেখালেন।

পুরো বিশ্বে হৈ চৈ পড়ে গেলো ইউনেস্কো রাশওয়ানকে বিশেষ পদকে ভূষিত করলো। ফ্রান্সসহ বহুদেশও বিশেষভাবে সম্মানিত করলো। হোসনী মুবারক তার দেশের বীরকে সর্বোচ্চ সম্মান দেয়ার আয়োজন করলো।

জাপানবাসী এ ঘটনায় এত বেশি অভিভূত হয়েছিল যে, রাশওয়ানকে আলাদা করে দাওয়াত দিল। তারা তীব্র কৌতূহলে ফেটে পড়ছিল। সবার একটাই প্রশ্ন।

-আপনি এমন একটা সুযোগ পেয়েও গ্রহণ করলেন না কেন?

প্রশ্নের উত্তরে রাশওয়ান তার একান্ত ভাবনা বিস্তারিত তুলে ধরে বললেন,

-আমার দ্বীন ও আখলাক আমাকে এমনটা করতে বাধা দিয়েছে।

জাপানীদের আচরণের দিক দিয়ে ভদ্র জাতি হিশেবে পরিচিত। তারা এমন মহৎ আদর্শের পরিচয় পেয়ে বিস্ময়াহত হয়ে গেলো। সর্বসম্মতিক্রমে রাশওয়ানকে 'সামুরাই' উপাধিতে ভূষিত করলো। স্কুলপাঠ্যতে রাশওয়ানের

জীবনী অন্তর্ভূক্ত করলো। এতেই ক্ষান্ত হলো না, কোমলমতি শিশুদের মধ্যে রাশওয়ানের অতুলনীয় চারিত্রিক গুণাবলীকে চারিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে পরীক্ষায় প্রশ্ন রাখতে শুরু করলো,

-তুমি রাশওয়ানের স্থানে হলে কী করতে?

উত্তরটা সহজেই অনুমেয়। নিষ্পাপ শিশুরা আত্মত্যাগের অপূর্ব এক শিক্ষা পেয়ে গেল। ভিনদেশী এক মহান মানুষ, তাদের দেশের একজনকে হারানোর সুযোগ পেয়েও হারায়নি। জেতার সুযোগ করে দিয়েছে।

= আমাদেরকেও এমন হতে হবে।

স্বর্ণপদকের বিনিময়ে 'বৌ' পাওয়ার ঘটনা বিশ্বের ইতিহাসে একবারই ঘটেছে বোধহয়। রাশওয়ান যেচে স্বর্ণপদক হারালেন। কিন্তু যা পেলেন, সেটা খাঁটি স্বর্ণের চেয়ে কম নয়। জাপান সফরে যাওয়ার পর রাশওয়ানের মতো এমন সৎ ও মহৎ মানুষ পেয়ে জাপানীদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো। এক বিমুগ্ধ জাপানী ললনা এমন বিরল মানুষের সন্ধান পেয়ে, মুসলমান হতে দেরী করলো না। বিয়েটা আর বাকী থাকবে কেন? আল্লাহ তা'আলা রাশওয়ানকে শুধু বধূই দিলেন না, ফুটফুটে তিনটা পদকও দিয়েছেন। যারা বাবার মতোই একজন ভালো মানুষ হিশেবে গড়ে উঠছে।

তো আমরা কী শিক্ষা পেলাম?

= সবাই জুডো খেলায় নেমে পড়বো?

জীবন জাগার গল্প: ৫৮৪

অন্ধ মুসাফির

এক.

এক লোক দূর গাঁ থেকে এসেছে। জরুরী এক কাজে ঢাকা যেতে হচ্ছে। রেলস্টেশনে এসে খেই হারিয়ে ফেলেছে জীবনেও ট্রেন দেখেনি। ট্রেনে করে কিভাবে ঢাকা যেতে হয় সেটাও জানে না। জানবে কী করে? জীবনে সে গ্রামের বাজার ছাড়া অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগই হয় নি! একজনের কাছে জানতে চাইল,

-ভাই! ঢাকার ট্রেনে চড়তে হলে কী করতে হবে?

-ওই ঘর থেকে টিকেট কাটতে হবে।

টিকেট কাটার পর জানতে চাইল,

-ভাই! ট্রেন জিনিসটা দেখতে কেমন?

-কালো রঙের, উপর দিয়ে ধোঁয়া বের হয়।

লোকটা টিকেট নিয়ে ফিরে আসতেই দেখল, কালো রঙের পোশাক পরা এক লোক হেঁটে যাচ্ছে। মুখে বিড়ি থাকার কারণে উপর দিয়ে ধোঁয়া বের হচ্ছে। ও আচ্ছা, এ ব্যাটাই তাহলে ট্রেন। দৌড়ে গিয়ে ঝাঁপিয়ে তার কাঁধে চড়ে বসলো। ট্রেন পেয়ে গেছি।

-এই মিয়া! আমার কাঁধে চড়লে কেন?

-চুপ কর, এই দেখ আমি টিকেট কেটেছি। এমনি এমনি চড়িনি! কোন কথা নেই। ঢাকা চল।

এখন দোষ কার? স্টেশন মাস্টারের? তিনি তো লোকটাকে ঠিকঠাক মতোই ট্রেনের পরিচয় দিয়েছেন। গাঁয়ের বুদ্ধু লোকটা না বুঝলে, সেটা কি মাস্টারের দোষ? কুরআন হাদীসে সঠিক কথাটাই বলা আছে। সাহাবায়ে কেরামও বিশুদ্ধ আমলই করে গেছেন। এখন কারো বুঝের সমস্যার কারণে

যদি মনে হয়, সাহাবায়ে কেরাম 'বেদাতী' কাজ করেছেন। সেটা কার দোষ? উমর (রা.) বা উসমান (রা.)-এর দোষ নাকি যাদের বুঝে ঘাটতি আছে তাদের?

দুই.

পাঠানজি বিয়ে করতে যাচ্ছেন। ক্ষেতি-জমিতে কাজ করতে করতে বিয়ের সময় করে ওঠা যায় না। বন্ধু-বান্ধবরা ধরে বিয়ে করাতে নিয়ে চললো। বউয়ের বাড়ির কাছাকাছি যাওয়ার পর একজন বললো,

-পাঠানজি! বহেনজির কাছে যাওয়ার আগে একটু চেহারাটা দেখে নিন না!

-ও তাইতো!

পাঠানজি দৌড়ে এক বাড়িতে গেলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন,

-একঠো আয়না হবে?

-হাঁ সাহাব! ইয়ে লীজিয়ে!

পাঠানজি জীবনে কখনো আয়নায় চেহারা দেখেননি। মুখের সামনে আয়না তুলে ধরলেন। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না।

-ভাইসাব! কী আয়না দিলেন কিছুই তো দেখা যায় না।

বাড়ির মালিক আয়না ফিরিয়ে নিয়ে ভালো করে মুছে আবার দিলেন। এবারও ফলাফল একই। আয়নার মালিক খেয়াল করে দেখলো, পাঠানজি আয়না উল্টো করে ধরে আছেন।

-আরে জি! আয়না ঠিক করে ধরুন। তবেই না চেহারা দেখা যাবে।

আয়নার কি কোনও দোষ আছে? কুরআন হাদীসের হাকীকত নিজে দেখতে না পেলে, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপানোর কোনও মানে হয়?

তিন.

ঈদের চাঁদ উঠেছে। সবাই দেখতে গেছে নদীর পাড়ে। বাড়ির ছাদে। ছেলের ময়লা পরিষ্কার করে বাড়ির নতুন বউটাও দৌড়ে উঠানে গেল। ননদকে জিজ্ঞেস করল,

-কোথায় চাঁদ?

-ওই যে!

বউ চাঁদ দেখে অবাক হয়ে গেলো। অভ্যাসবশত মুখে হাত রেখে উপরের দিকে তাকাল। একটু পরেই নাক সিঁটকে বলে উঠলো:

-হুঁহ! নতুন চাঁদে দেখি দুর্গন্ধ!

শাশুড়ি ব্যাপারটা ধরতে পেরে বললেন,

-বউমা! চাঁদে নয় গন্ধ তোমার আঙুলে! ছোট মিয়ার 'ইয়ের' গন্ধ!

কেউ যদি নিজের চিন্তার অসংলগ্নতাকে কুরআন হাদীসের ওপর চাপিয়ে দেয় দোষ কার?

চার.

মেঘলা আকাশ। পুরো গাঁয়ের মানুষ অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কেউই চাঁদ দেখতে পাচ্ছে না। এক বৃদ্ধ মাগরিব পরে সবার সাথে যোগ দিলেন। চাঁদ দেখা উৎসবে। এসেই সরবে বলে উঠলেন,

-ওই তো চাঁদ!

-কোথায়? আমরা এতক্ষণ ধরে খুঁজছি!

-ওই যে মসজিদের মিনারের মাথায়, নারকেল গাছটার ডানে?

-কই! পুরো আকাশ জুড়ে কোথাও চাঁদের চিহ্নও দেখা যাচ্ছে না।

গ্রামের আরেক জ্ঞানী বুড়ো বিষয়টা ধরতে পারলেন। এগিয়ে এসে বুড়োর চোখের দিকে তাকালেন। দেখা গেলো, চোখের ওপর একটা শুভ্র ভ্রু লটকে আছে। আঙুল দিয়ে ওটা সরিয়ে দিয়ে বললেন,

-এবার চাঁদ দেখা যায়?

-আরে, চাঁদটা কোথায় লুকোল?

এই হলো আমাদের কিছু ভাইয়ের অবস্থা। দীনকে নিজের মতো করে মনগড়াভাবেই ব্যাখ্যা করি। মধ্যখানে যে 'কিছু ভুল চিন্তার চুল' লটকে আছে, সেটা টের পাই না।

জীবন জাগার গল্প: ৫৮৫

ব্যাস এক মিনিট!

দীর্ঘ লাইন ঠেলে শেষ পর্যন্ত টিকেট কাউন্টারে উপনীত হতে পারলাম। আমার পেছনেও অনেক মানুষ। আগামীকাল সাপ্তাহিক ছুটি তাই এমন ভীড়। আমার সামনে আর মাত্র একজন। তারপরই আমার পালা। সামনের জন ষাটোর্ধ এক বৃদ্ধা। কাউন্টারে বসা মেয়েটা বললো,

-দুঃখিত! আপনার অতিরিক্ত আরো এক ইউরো লাগবে।

-কেন? টিকেটের দাম তো দিয়েছি!

-তা দিয়েছেন, তবে স্টেশনে প্রবেশের জন্যে ও অপেক্ষার জন্যে অতিরিক্ত এক ইউরো চার্জ দিতে হবে।

-আমার কাছে আর কোনও ইউরো নেই!

-সেক্ষেত্রে আপনাকে আমি আপাততঃ কোনও সাহায্য করতে পারছি না। কী করবেন ভেবে দেখুন। এখন দয়া করে লাইন থেকে সরে দাঁড়ান! পেছনের জনকে আসতে দিন!

আমি এগিয়ে গিয়ে বৃদ্ধার সমস্যাটা জানতে চাইলাম। টিকেটদাতা মেয়েটি বিষয়টা জানাল। সাথে সাথে বললাম,

-এক ইউরো তো, আমিই না হয় তার পক্ষ থেকে আদায় করে দিচ্ছি!

বৃদ্ধা আবার লাইনে ফিরে এলেন। স্টেশন পাসসহ টিকেট কাটলেন। কাজ শেষ করে চলে গেলেন না। অদূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ভাবলাম, কৃতজ্ঞতা জানানোর জন্যে অপেক্ষা করছেন। টিকেট কাটা শেষ হলো। বৃদ্ধা কিছু বললেন না। ভেতরে ভেতরে একটু অবাক হলাম। পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়ার সময় বৃদ্ধা আমাকে ডাক দিলেন। কোনও কথাবার্তা ছাড়াই অনেকটা হুকুমের স্বরে বললো,

-আমার ব্যাগটা নাও। ওটা ভীষণ ভারী। উঠিয়ে ট্রেন পর্যন্ত নিয়ে যেতে আমার কষ্ট হবে। বৃদ্ধার আচরণ আমাকে অবাক করলো। তবুও কিছু না বলে ব্যাগটা হাতে নিলাম। হাতটা মূল থেকে ছিঁড়ে আসার উপক্রম হলো। আল্লাহই জানেন কী আছে ওটাতে! যথাসময়ে ট্রেন এল। টিকেট নাম্বার দেখে বুঝতে পেরেছিলাম, আমা'র আসন জানলার ধারেই হবে। মহিলা যেহেতু

আমার আগে টিকেট কেটেছে, তার আসনও আমার পাশেই হবে। বগিতে উঠে, বৃদ্ধা আমাকে ঠেলে আগেই জানলার কাছটিতে বসে গেলেন। কত আশা ছিল জানালার পাশে বসে দীর্ঘ পথ বরফঢাকা প্রকৃতি দেখবো, সব মাঠে মারা গেলো বুড়ির নির্লজ্জ লোলুপতায়!

ট্রেন চলতে শুরু করলো। চুপচাপ বসে আছি। না তাকিয়েও বুঝতে পারছিলাম, বুড়ি আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছে। বেশ অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম। বুড়ি আমার দিকে এমন ঠায় তাকিয়ে আছে কেন? থাকতে না পেরে তার দিকে ফিরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলাম! এবার বুড়ি মুচকি হেসে বললো,

-নিশ্চয় তোমার মনে কিছু প্রশ্ন জমা হয়েছে?

-জি!

-প্রথমেই বলে রাখছি, আমি এতক্ষণ ধরে তোমার ধৈর্য্যটা পরীক্ষা করে দেখছিলাম। তুমি মুখ ফুটে আমাকে কিছু বলো কি না, সেটার অপেক্ষা করছিলাম। তোমার চোখেমুখে বিরক্তিভাব জাগে কি না তাও বোঝার চেষ্টা করছিলাম।

-আমার ধৈর্য পরীক্ষা করছিলেন? কিভাবে?

-তুমি যাই বলো, তুমি এতক্ষণ চুপ থেকে কী ভাবছিলে সেটা আমি বলে দিতে পারবো!

-আমার তা মনে হয় না!

-আচ্ছা সেটা পরে দেখা যাবে! এখন আমার পুরো চিন্তা হলো তোমার ঋণটা পরিশোধ কিভাবে করা যায় সেটা নিয়ে।

-আপনার কাছে যেহেতু এখন কোনও বাড়তি ইউরো নেই, তাই সেটা নিয়ে শুধু শুধু কেন ভাবছেন?

-ইচ্ছা থাকলে ঋণ পরিশোধের কত উপায়! আমার কাছে একটা 'জিনিস' আছে, সেটা বিক্রি করবো! তুমি সেটা কিনবে নাকি অন্য কারো কাছে যাবো?

-জিনিসটা কী সেটা না জেনে কিভাবে বলি?

-সেটা আসলে কোনও বস্তুগত জিনিস নয়, জ্ঞানগত। একটা 'হিকমত' বা প্রজ্ঞা। মাত্র এক ইউরোর বিনিময়ে বিক্রি করবো তোমার কাছে! নিবে?

-তোমার 'প্রজ্ঞা-বাক্য' যদি আমার মনমত না হয়, আমার ইউরো ফেরত দিবে?

-না, সেটা হবে না। তুমি টাকা ফেরত নিতে পারবে, কিন্তু আমি কি আমার 'প্রজ্ঞা-বাক্য' ফেরত নিতে পারবো? তুমি তো শুনেই ফেলবে? তোমার পছন্দ হলেও তুমি বলতে পারো, তোমার পছন্দ হয়নি! অথচ উপকারটা ঠিকই পেয়ে গেলে! যদিও জানি তুমি এমনটা করবে না তবুও আমাকে সতর্ক থাকতে হবে তো! আর তোমার হারাবার কিছু নেই। আমি ইউরোটা তোমাকে ফেরত দেবোই! ঋণ শোধ করতে!

-ঠিক আছে এই নাও এক ইউরো!

ইউরো দিতে গিয়ে এই প্রথমবার বৃদ্ধার চেহারার ওপর চোখ পড়লো। পুরো মুখে বলিরেখার বিস্তার। চোখদুটোতে অসম্ভব ধারালো দৃষ্টি! এক ধরনের আভিজাত্য পুরো চেহারাটাতে লেপ্টে আছে। দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, তিনি একজন শিক্ষিতা ও মার্জিতা! টাকাটা হাতে নিয়েই মুঠোবন্দী করে ফেললেন। একবারে বাচ্চা মেয়ের মতো। যেন অন্যদের থেকে খেলনাটা লুকিয়ে রাখছে। তাগাদা দিয়ে বললাম,

-কই তোমার 'প্রজ্ঞা-বাক্য'?

-বলছি শোন! আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। ডক্টরেট করেছি কুনফুশীয় দর্শন নিয়ে। দর্শনশাস্ত্র নিয়ে অধ্যাপনা করেই জীবন কেটেছে। এক বান্ধবীকে বিদায় দিতে শহরে এসেছিলাম। সে তার স্বামীর সাথে আরেক দেশে চলে যাচ্ছে। সেখানেই বাকী জীবনটা কাটাবে। সে অবশ্য ডাক্তার। তাকে বিদায় দিতে গিয়ে বাড়তি কিছু খরচ করে এই অবস্থায় পড়েছি। তবুও হিশেব মতো টাকা ছিলো। বেয়াড়া ট্যাক্সি চালক অন্যায়ভাবে জোর করে একটাকা বেশি বখশিশ চেয়ে নিল! সেটাই আমাকে টিকেট কাউন্টারে ভুগিয়েছে। এক অর্থে ভালোই হয়েছে। না হলে তোমার মতো একজন উদারচিত্তের যুবকের দেখা মিলতো কী করে?

-এক ইউরোর মধ্যে আপনি উদারচিত্তের কী দেখতে পেলেন?

-তুমি বোধ হয় ভুলে যাচ্ছো, আমি দর্শনশাস্ত্রের একজন পোড় খাওয়া অধ্যাপক! এখানে টাকার পরিমাণ মুখ্য নয়। তুমি যেভাবে আমার অসহায়ত্ব দেখে বিন্দুমাত্র চিন্তা ছাড়াই আমাকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নিলে সেটাই আমাকে ভীষণ মুগ্ধ করেছে!

-আমার ধারণা সত্যি প্রমাণিত হলো!

-কী ধারণা?

-আমি জানতাম, আপনি এক সময় আপনার জীবনবৃত্তান্ত সংক্ষেপে হলেও খুলে বলবেন! এখন আমার 'পণ্য' কোথায়? প্রজ্ঞা-বাক্য?

-'ব্যাস এক মিনিট'!

-ঠিক আছে, এক মিনিট কেন, বাকী পথ পুরোটাও অপেক্ষা করতে রাজি!

-না হে সহৃদয় যুবক! এক মিনিট অপেক্ষার কথা বলিনি! 'ব্যাস এক মিনিট' এটাই হলো আমার প্রজ্ঞা-বাক্য!

-বুঝিনি!

-তুমি যখন আমার জন্যে এক ইউরো বিনা বাক্য ব্যয়ে দিয়ে দিলে, তখনই আমার মনে হয়েছে, তোমার মধ্যে একটা মহৎ হৃদয় বাস করে। তোমার জীবনে উপকারে লাগে এমন কিছু করতে পারলে আমার ভাল লাগবে! তাই শুরু থেকেই তোমার সাথে ভিন্নধর্মী আচরণ করতে শুরু করেছিলাম! এবার শোন প্রজ্ঞা-বাক্যের ব্যাখ্যা।

= তুমি যখনই গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নিতে যাবে, সবকিছু গুছিয়ে ওঠার পর সিদ্ধান্ত নেয়ার ঠিক আগমুহূর্তে বাড়তি এক মিনিট আরো সময় নিবে। ভেবে দেখবে সঠিক সিদ্ধান্তটাই কি নিতে যাচ্ছো? মাত্র ষাট সেকেন্ড! তুমি ভাবতে পারছো, ষাট সেকেন্ডে চাইলে তুমি কত কিছু ভেবে ফেলতে পারো? এই ষাট সেকেণ্ডেই অনেক কিছু বদলে যেতে পারে! তবে সঠিক ফল লাভের জন্যে একটা শর্ত আছে!

-কী শর্ত?

-এই এক মিনিটে তুমি তোমার মন-মাথাকে সম্পূর্ণ শূন্য করে ফেলবে। সব ধরনের আবেগ থেকে। মানবিক ও চারিত্রিক মূল্যবোধ থেকে। কোনও পক্ষপাত ছাড়াই 'সমস্যা' নিয়ে ভাবতে বসবে! নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে যাচাই করে দেখবে তারপর সিদ্ধান্ত নিবে। (সুন্নত তরীকা হলো, সালাতুল হাজত বা ইস্তেখারার দু'আ পড়ে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নেয়া)।

ধরা যাক তুমি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হলে, অমুক তোমার প্রতি জুলুম করেছে। তার বিরুদ্ধে বিচারসভা ডাকবে। তখন শেষ মুহূর্তে হলেও এক মিনিট একটু ভাববে। তুমি যেমনটা ভাবছো, প্রতিপক্ষও কি নিজেকে 'হকদার' ভাবছে না? এমন করে ভাবলে, কখনো কখনো দেখবে, পুরোটা না হলেও, অপরপক্ষ তোমার কাছে কিছু হলেও 'পাওনাদার' হয়ে আছে!

কাউকে শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর এক মিনিটের জন্যে হলেও ভাববে: ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে কি না, তাহলে দেখা যাবে কখনো কখনো শাস্তির মাত্রা কমে গেছে বা ক্ষমার যোগ্য হয়ে গেছে।

দেখো, এক মিনিটের গুরুত্বের কথা বলতে আমিও এক মিনিটের বেশি সময় নিইনি!

-ঠিক বলেছেন। আমার এক ইউরো ব্যয় করাটা অত্যন্ত লাভজনক হয়েছে।

-সত্যি বলছো? ঠিক আছে, তাহলে এই নাও তোমার সেই এক ইউরো! যেটা তুমি আমার জন্যে ব্যয় করেছিলে। আর তোমার প্রতি রইল আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা। তুমি যেচে এগিয়ে না এলে, মুখ ফুটে কারো কাছে এক ইউরো চাইতে বড় বাধতো! চাওয়াই হতো না!

-আচ্ছা ম্যাম! আপনার সাথে ব্যবসা করে মনটা বড় লোভী হয়ে উঠেছে! আমি যদি আপনাকে একশ ইউরো দেই, তার বিনিময়ে আপনি আমার কাছে কী বিক্রি করবেন?

-সত্যি? তাহলে আমি সেটাকে বিয়ের 'মোহরানা' ধরে নিবো। তোমার স্ত্রী হওয়ার জন্যে নিজেকে তোমার হাতে তুলে দেবো!

একথা বলেই বৃদ্ধা খিলখিল করে হেসে উঠলো। বগিতে থাকা আশেপাশের যাত্রীরাও কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে চোখ তুলে তাকাতে লাগলো। আমি লজ্জায় ঝট করে উঠে যেতে উদ্যত হলাম। তিনি বললেন,

-আহ চটছো কেন, আমি দুষ্টুমি করেছি। তোমার ভয় নেই। আমার স্বামী এখনো জীবিত! এত তাড়াতাড়ি তাকে হারাতে চাই না! তুমি বসো! ব্যাস এক মিনিট ভাবো!

-ও হ্যাঁ, তাইতো!

তার গন্তব্য প্রায় চলে এসেছে। হঠাৎ করেই আমার মনটা কেন যেন বিষণ্ন হয়ে পড়লো। বৃদ্ধা নেমে যাবেন তার আগাম ভাবনাতেই হয়তো! দু'জনেই চুপচাপ। তিনি বললেন,

-আমার মোবাইলে ব্যালেন্স আছে কি না নিশ্চিত নই, তুমি কি মোবাইলটা দেবে, আমার স্বামীকে আসার সংবাদটা জানাবো?

-অবশ্যই!

তিনি নেমে গেলেন। চারদিকটা কেমন শূন্যতায় ছেয়ে গেলো। অল্প সময়।

অথচ মনে হচ্ছিল আমরা যুগ যুগ ধরে একসাথে ভ্রমণ করেছি! এবার জানলার ধারে বসতে আর বাধা নেই। প্রকৃতির শোভা উপভোগ করছি আর ভাবছি। মোবাইলে পরপর দু'টো মেসেজ এল।

প্রথম মেসেজঃ তোমার জন্যে সামান্য কিছু 'উপহার' পাঠালাম . আশা করি তোমার ভ্রমণপথে কাজে লাগবে। আরও যদি লাগে জানিও! সংকোচ করো না! ভীষণ খুশি হবো জানালে।

দ্বিতীয় মেসেজঃ আমার মোবাইলে ব্যালান্স ছিল। কিন্তু তোমার নাম্বারটা নেয়ার কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে এই কৌশলের আশ্রয় নিতে হলো।

আমি ফিরতি মেসেজে লিখলাম,

-আপনার কাছ থেকে কেনা পণ্যটা আমার সারাজীবনের পাথেয় হিশেবে থাকবে। পণ্যটাকে বিনিয়োগ করে অনেক মুনাফা করতে পারবো বলে আশা রাখি!

জীবন জাগার গল্পঃ ৫৮৬

ঈদের আগে আন্দোলন

রমজান মাস আসন্ন। বিশ্বের সব দেশের মতো 'ওমুক' দেশেও প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বাজার সদাই করতে হবে। এক লোক মার্কেটে গেল। পরিবারের জন্যে রমজানের বাজার করবে। সুপারশপে প্রবেশ করতে প্রথমেই ডিমের ওপর চোখ পড়লো। এক কেইস ডিম কিনবে বলে ঠিক করলো। দাম জানতে চাইলে পাশে অপেক্ষমান সেলসবয়ের কাছে। বয় দামটা অন্য দিনের তুলনায় একটু বাড়িয়ে বললো।

-দাম বাড়লো কখন? এই গত কয়েকদিন আগেও তো আরো কম দামে ডিম কিনেছিলাম?

-জি সেটা ঠিক আছে। পোল্ট্রি ফার্ম সমিতি হঠাৎ করে ডিমের দাম চড়িয়ে দিয়েছে। আমরা কী করবো?

লোকটা আর কিছু না বলে, ডিমের কেইসটা স্বস্থানে রেখে দিল। দরকার নেই ডিম কেনার। ওটা ছাড়াও ইফতার-সাহরী চলবে। ভালোভাবেই। শপে আরও ক্রেতা ছিল, তারাও লোকটার দেখাদেখি ডিম কেনা থেকে বিরত রইল। কোনও প্রকার প্রচার ছাড়াই পুরো শহরের ক্রেতারা একই আচরণ করলো।

দিন শেষে দেখা গেলো একটা দোকানেও ডিম বিক্রি হয়নি। সব অবিক্রিত অবস্থায় থেকে গেছে।

পরদিন পোল্ট্রি কোম্পানীর গাড়ি এল, আগের দিনের খালি হওয়া কেইসগুলো নিয়ে যাবে। ডিমের নতুন চালান দিয়ে যাবে। কোথায় টাকা বুঝে নেবে উল্টো দোকানদাররা তাদের কাছে অভিযোগের পাহাড় তুলে ধরল।

-আপনারা কোনও কারণ ছাড়াই ডিমের দাম বাড়িয়েছেন। গতকাল পুরোটা দিন ক্রেতাদের প্রশ্ন সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। ব্যবসার ক্ষতি তো হয়েছেই!

সমিতির মাথায় হাত! এখন উপায়? গতকালের উৎপাদন বিক্রি না হলে, আজকের নবোৎপাদিত ডিম নিয়ে তারা কী করবে? একদিন বিক্রিবাট্টা বন্ধ থাকায়, বাজারে ভোক্তার চাহিদার তুলনায় পণ্য বেশি হয়ে গেলো না? পণ্যস্ফীতি দেখা দিলে পোল্ট্রিশিল্প দেউলিয়া হয়ে যাবে। তারপরও তারা মনে করলো, জনগণ ক'দিন ডিম না কিনে থাকতে পারবে? একদিন? দু'দিন? বড় জোর তিনদিন! এরপর না কিনে যাবে কোথায়? ঠিকই আমাদের দামের কাছে মাথা নোয়াতে হবেই!

তারা ডিমের দাম কমালো না। আপন অবস্থায় গোঁ ধরে রইল। ক্রেতারাও কোনও এক অদৃশ্য যোগসূত্রের কারণে, ডিম কেনা বন্ধ রাখল। ডিমকে তারা সম্পূর্ণ বয়কট করলো। তিনদিন পার হওয়ার পরও অবস্থার পরিবর্তন হলো না। ডিম উৎপাদকরা পড়লো ভীষণ বিপাকে! এদিকে প্রতিদিনই উৎপাদন বেড়েই চলছে। মুরগিরা তো ডিম পাড়া বন্ধ রাখতে পারে না। স্বাভাবিক নিয়মেই তারা ডিম পেড়ে যেতে লাগলো। গুদামে গুদামে ডিমের পাহাড় জমে গেলো। বিপুল সংখ্যক ডিম পঁচতেও শুরু করলো।

ডিমসমিতির টনক নড়লো। বৈঠকে বসে সিদ্ধান্ত নিলো, জাতির কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা চাইবে। আর এ-কয়দিনে জমে যাওয়া ডিমগুলো বিক্রি হওয়া পর্যন্ত ডিমের দাম আগের চেয়েও এক চতুর্থাংশ কমিয়ে দেয়া হবে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে, ডিমের মূল্য আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। বিনা প্রয়োজনে, সরকারী অনুমোদন ছাড়া ভবিষ্যতে কখনো ডিমের দাম বাড়ানো হবে না।

ডিমের বাজার এবার স্বাভাবিক হয়ে এল। অন্যান্য পণ্য দ্রব্য-ব্যবসায়ীরাও সতর্ক হয়ে গেলো। বেতাল করার সাহস পেল না।

(এমন ঘটনা সত্যি সত্যি আর্জেন্টিনাতে ভিন্ন এক প্রেক্ষাপটে ঘটেছিল।)

জীবন জাগার গল্প: ৫৮৭

দারআর তীরে!

সালেহ কামালি। জন্ম, বেড়ে ওঠা, জীবন-যৌবন এই দারআতে। পড়াশোনার জন্যে অনেকে বাইরে ফাস বা কাযভীনে গেলেও তিনি এখানেই পড়াশোনার পাট চুকিয়েছেন। বাবার কাছে। দাদার কাছে। বাবার আগ্রহেই বাইরে যাওয়া হয়নি। সালেহের ইচ্ছে ছিল পাশের দেশ মৌরিতানিয়াতে যাওয়ার। ওখানকার শানকীত শহরের বড় বড় আলিমগণের সোহবতে কিছুদিন কাটিয়ে আসার। কিন্তু দাদাজানের কড়া নিষেধাজ্ঞা ঠেলে যাওয়া হয়নি। আব্বু-দাদু উভয়েই মরক্কোর প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থায় আস্থা রাখতেন না। কারন শিক্ষামাধ্যম আরবী-আমাযীগ হলেও, ভেতরের শাঁসের পুরোটাই ছিল ফরাসী। এই শিক্ষা-কারিকুলাম একটা শিশুকে ফরাসীদের গোলামে পরিণত করবে। দারআবাসীরা স্বাধীন জীবনে বিশ্বাসী। কারো অধীনতা তাদের কাছে বিষতুল্য। কিন্তু বাহ্যিক গোলামীকে ঠেকিয়ে রাখলেও, চিন্তার গোলামীকে ঠেকানো গেল না। কারণ দারআর প্রতি ঘরে-বাইরে অনেকেরই শ্যেনদৃষ্টি!

✍

গ্রীক বিজ্ঞানী বিতলীমুসের আঁকা, বিশ্বের সর্বপ্রাচীন মানচিত্রেও দারআর উল্লেখ আছে। দারআয় অবস্থিত পর্বতগাত্রে খোদাই করা বিভিন্ন দেয়ালচিত্র প্রমাণ করে, প্রাচীন কাল থেকেই এখানে মানুষ বসবাস করে আসছে!

দারআ তিনভাগে বিভক্ত। দারআর মধ্যাঞ্চলই মূল অংশ। দারআর বেশির ভাগ মানুষ 'আমাযীগ' বারবার। এখানে খাঁটি আরবীবাসী যেমন আছে, কালো মানুষ আছে। ইহুদিও আছে। যদিও তাদের বেশির ভাগ ফিলিস্তীনে হিজরতে করে চলে গেছে। কিন্তু রাবাতের রাজপ্রাসাদের ইহুদিদের অত্যন্ত শক্ত প্রভাবের কারণে, এই সুদূর দারআতেও গুটিকয়েক ইহুদি এবং চলে যাওয়া ইহুদিদের বাস্তুভিটা পুর্ণ নিরাপত্তায় সংরক্ষিত আছে। বাদশা হাসানের প্রধান উপদেষ্টা একজন ইহুদি। তিনি নিজে দারআর ইহুদিবসতি ও পরিত্যক্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির দেখভাল করেন।

✍

সালেহ কামালি দাদু আর আব্বুর কাছে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে পড়াশোনা করলেও, যোগ্যতায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের চেয়ে কোনও অংশে কম যান

না। চাইলে বড় কোনও শহরে গিয়ে ভাল কোনও চাকুরি জোটাতে পারতেন। কিন্তু পরিবারের ঐতিহ্য অনুযায়ী একজন নিরীহ গ্রাম্য শিক্ষক হিশেবে জীবন কাটিয়ে দেয়াকেই শ্রেয় মনে করলেন। অবৈতনিক কর্মজীবন। রুজি বলতে, পারিবারিক খেজুর বাগান থেকে যৎসামান্য আয়! স্ত্রী তো সেই কবে তাকে ফাঁকি দিয়ে পরপারে পাড়ি জমিয়েছে! পোষ্য বলতে তিনি আর মা-হারা একমাত্র সন্তান সুবাইতা। রান্নাবান্নার কাজ বাপ-বেটির যৌথ আয়োজনেই সারা হয়।

✍

দারআর আয়তন প্রায় ১২শ কিলোমিটার। মাঝেমধ্যে জনবসতি! দারআ মরুভূমি হলেও এখানে জনবসতির মূল কারণ হলো, এঁকেবেঁকে বয়ে চলা 'দারআ' নদী। আতলাস পর্বতমালা থেকে বের হয়ে, আটলান্টিকে প্রতিদিন লক্ষ-লক্ষ কিউসেক সুপেয় মিষ্টি পানি ঢেলে দেয়া দারআ, এখানকার মানুষের নাড়িছেঁড়া ধন। এ-নদীর ছোঁয়াতেই দারআ মরু অঞ্চল হয়েও এত সবুজ-শ্যামল। এখানকার জমি এত উর্বর! নদীর কারণেই এখানকার ইতিহাস এত প্রাচীন!

✍

সালেহ কামালি শিক্ষক হলেও পাশাপাশি একজন একজন কৃষিবিদও! খেজুর গাছের বিভিন্ন রোগের চিকিৎসা করতে পারেন। উৎপাদিত খেজুরকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণ করতে পারেন। দারআর মানুষকে তিনি এ-বিষয়ে অকাতরে সহযোগিতা করেন। অবসর সময়ে গাইডের কাজও করেন। বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে ফ্রান্স থেকে আসা পর্যকটদের পুরো এলাকা ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখান। কোনও বিনিময় ছাড়াই। এমন নিঃস্বার্থ মানুষকে কেউ ভালো না বেসে পারে?

✍

ফরাসি উপনিবেশিক আমল থেকেই এতদঞ্চলের প্রাচীন স্থাপনা ও পুরাকীর্তিগুলো সবাইকে আকৃষ্ট করতো। কিন্তু সংরক্ষণের যথাযথ উদ্যোগের অভাব ছিল। সহস্রাধিক বছরের এই সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখতে হলে প্রচুর অর্থবিত্তের প্রয়োজন। ইহুদিবান্ধব রাজা হাসানের রাজকোষ এদিকটাতে খুব একটা মনোযোগী নয়। সরকারী অবহেলা আর স্থানীয় জনগণের তাগিদ, দুই

মিলিয়ে তৈরী হলো 'চাহিদা'! প্রশাসনের অবহেলার কারণে সৃষ্ট শূন্যস্থান পূরণে এগিয়ে এসেছে বহিঃশক্তি। ফরাসী সরকার অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে, ইউনেস্কোর অধীনে এখানে একটা অফিস খুললো। ব্যাপক তোড়জোড় করে প্রচারণা চালানো হলো। তারা ডামাঢোল পিটিয়ে এলাকাবাসীকে যা বলতে চাইলো,

১. অত্র এলাকার উন্নয়নকল্পে যা যা করণীয় আমরা সবই করব।
২. আমরা এখানকার মৃতপ্রায় মৃৎশিল্প ও অলংকারশিল্পকে পুনর্জীবন দান করব।
৩. নারীশিক্ষার ব্যবস্থা করব।
৪. পুরো অঞ্চলকে শিক্ষা-দীক্ষা ও অর্থনীতিতে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার জন্যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব।
৫. বেকারভাতা ও বয়স্কভাতার ব্যবস্থা করব।
৬. উদ্যোগী তরুণদের জন্যে বিদেশে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করব।

✍

বেশ লোভনীয় প্রস্তাবাবলী। প্রথম দিকে মানুষ সরল মনে লুফে নিল। সালেহ কামালি বেশ সতর্কতার সাথে পরিস্থিতি যাচাই করছিলেন। তিনি তার কর্মপন্থা ঠিক কী হবে, নির্ণয় করে উঠতে পারছিলেন না। বাহ্যিকভাবে ফরাসীদের উদ্যোগকে খারাপ বলার কোনও জো নেই। কিন্তু তিনি আফ্রিকার ইতিহাস ভালোভাবে পড়েছেন। তিনি নিশ্চিত, দারআবাসীর সামনে ভয়ংকর বিপদ! একান্ত অনুগত কিছু ছাত্রকে বিষয়টা বোঝালেন। আস্তে আস্তে অনেক কিছু পরিষ্কার হতে শুরু হলো। স্থানীয় ইহুদিরা দলে দলে ইউনেস্কোর আয়োজনে যোগ দিলো। ইহুদি নারীরাই বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মুসলিম নারীদেরকে বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়ে যেতে শুরু করলো। বিদেশীকর্মীদের মধ্যে একজন ছাড়া বাকী সবাই নারী। বলা ভালো সবাই উচ্চ শিক্ষিতা আধুনিক তরুণী। তারা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নারীদেরকে তো বটেই, তরুণদেরকেও দলে ভেড়ানোর কাজ শুরু করলো।

✍

প্রথম প্রথম বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণে নারী ও পুরুষ আলাদা আলাদা ক্লাসে বসতো। শিক্ষকও হতো আলাদা আলাদা। পরে আস্তে আস্তে ক্লাসগুলো

একসাথে হতে শুরু করল। শিক্ষকেরও কোনও তারতম্য থাকলো না। বিদেশ যাওয়ার তরুণরা রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেল। তরুণীদের সামনেও রঙ ঝলমলে জীবনের হাতছানি! এক বছরের মাথায় দারআর অবস্থা-পরিবেশ বেশ পাল্টে গেল। তারা একটা স্কুলও খুলেছে। ধর্মশিক্ষা ছাড়া বাকী সবই সেখানে সেখানো হয়।

✍

সালেহ কামেলির হাতে প্রথম দিকে কোনও যুক্তি ছিল না। এখন যারা একটু গভীরে গিয়ে ভাবতে পারেন তাদের বুঝতে বাকী রইল না, বিদেশীরা এখানে ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে আসেনি। তারা যা প্রকাশ করেছে, সেটা তাদের মূল উদ্দেশ্য নয়। এর মধ্যে একদিন এক তরুণী সালেহের বাড়িতে এসে উপস্থিত! একথা সেকথার পর বললো,

-আমরা আমাদের স্কুলে আপনার মেয়ে সুবাইতাকে ভর্তি করাতে চাই!

-প্রথমতঃ আমি আপনার সাথে নয়, আপনাদের দলে কোনও পুরুষ থাকলে তার সাথে কথা বলতে চাই! দ্বিতীয়তঃ সুবাইতা ঘরেই পড়বে! অন্য কোথাও নয়! আমাদের হাবেলীর আঙিনাতেই অনেক আগ থেকে একটা মাদরাসা চলে আসছে!

-আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি এখানে শুধু ধর্মীয় বিষয় শিক্ষা দেয়া হয়!

-আপনার জানাটা অসম্পূর্ণ! আমাদের তত্ত্বাবধানে একটা স্কুলও পরিচালিত হয়! সেখানে অন্যকিছুও শিক্ষা দেয়া হয়!

✍

সেদিনের মতো ইউনেস্কো-তরুণী চলে গেলো। সালেহ কামালি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পর সেই তরুণী আবার এলো। এবারো আগের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। আরেক দিন তিনি ঘরে ছিলেন না। ফিরে দেখেন, সুবাইতা সেই তরুণীর সাথে বসে বসে কথা বলছে!

✍

এরমধ্যে একটা ঘটনা ঘটলো। কয়েকজন তরুণ-তরুণীকে তারা রাজধানী রাবাতে নিয়ে গেলো তারা ফেরার পর জানা গেলো, তাদেরকে এ-কয়দিন একটা গীর্জার অতিথিশালায় রাখা হয়েছিল। গীর্জার বিভিন্ন কার্যক্রমে তাদেরকে অতি সম্মানের সাথে নিয়ে যাওয়া হতো। আরো অনেক কিছু......!

এবার মুরুব্বীদের টনক নড়লো। আগে যারা সালেহ্ কামালির কথায় কান দিতো না, তারাও একটু একটু আগ্রহী হতে শুরু করলো। কিছু লোক ক্ষেপে গিয়ে বিদেশিনীদেরকে জোর করে তাড়াতে উদ্যত হলো। অনেক বলেকয়ে তাদেরকে নিরস্ত করা হলো।

✍

ইউনেস্কোর কাজ এখন মোটামুটি চালু হয়ে গেছে। একজন এখানে নিয়মিত থাকে। বাকীরা বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। এখানে কিছু স্থানীয় সহযোগীও তৈরী হয়ে গেছে! তারাও কার্যক্রম পরিচালনায় অংশ নেয়।

আগে এখানে ডিশ ছিল না। ইউনেস্কো এখানে এসেই কম্যুনিটি সেন্টার খুলেছে। সেখানে তারা বিরাট বড় স্ক্রীনে টিভি দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছে! দলে দলে নারী-পুরুষ গিয়ে সেখানে আসর জমাতো। এই ডিশই ফরাসীদের জন্যে জন্যে বিপদ ডেকে আনলো!

✍

শার্লি এবদো হামলার পর, পত্রিকা কর্তৃপক্ষ গোয়ার্তুমি করে ঠিক করলো আবারো ব্যঙ্গ করে বিশেষ সংখ্যা ছাপবে। এসব খবর স্থানীয়রা ডিশের মাধ্যমেই পেয়ে গেলো। তরুণরা খেপে গেলো। সব রাগ গিয়ে পড়ল থেকে যাওয়া একমাত্র ফরাসিনীর ওপর। তারা আগে থেকেই রেগে টং হয়ে ছিল, এখন যেন আগুনে ঘি ঢালা হলো। এখানকার লোকদের বিশ্বাস, তাদের পূর্বপুরুষরা কুরাইশ বংশের একটা শাখা ছিল! কারবালার ঘটনার পর, একদল কুরাইশ এদিকে এসে বসতি গেঁড়েছিল। তাই নবীজির ওপর আক্রমণের কারণে উত্তেজিত হওয়ার পেছনে, ধর্মীয় আবেগের পাশাপাশি বংশীয় টানও বাড়তি অনুষঙ্গ হিশেবে কাজ করছিল।

✍

সালেহ্ কামালি তরুণদেরকে হঠকারী কিছু করতে নিষেধ করলেন। সবাইকে যার যার ঘরে পাঠিয়ে দিলেন। সেদিন গভীর রাতে তার ঘুম ভাঙলো প্রচণ্ড হৈ চৈ আর শোরগোলের শব্দে! ঘরের দরজা খুলতেই হুড়মুড় করে একজন হুমড়ি খেয়ে তার গায়ের ওপর পড়লো।

-আমাকে বাঁচান! ওরা আমাকে মেরে ফেলবে!

সালেহ্ দেখলেন ফরাসী তরুণী ভয়ে থরথর করে কাঁপছে! অভয় দিয়ে বললেন,

-আপনার কোনও ভয় নেই!

✍

সালেহ ফরাসিনীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে, বাইরে বের হলেন। দিনের বেলা যাদেরকে নিরস্ত করেছিলেন তারা মশাল হাতে খোঁজাখুঁজি করছে। তারা টের পায়নি, তার ঘরেই মেয়েটা আশ্রয় নিয়েছে। সালেহ আবারও তাদেরকে অনেক করে বোঝালেন। আশ্বাস দিলেন, বিদেশীদের সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করার উদ্যোগ নিবেন। আগামীকালই যেন তারা এখানকার পাততাড়ি গুটিয়ে বিদেয় হয় সে ব্যবস্থা নিবেন! এলাকার সবাই মিলেই এটা করা হবে!

✍

ঘরে ফিরে তিনি মেহমানের খাবারের ব্যবস্থা করলেন। সুবাইতাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে, তাকে দিয়ে খাবার পাঠিয়ে দিলেন। পরদিন কথামত বিদেশীদের অফিস তালাবদ্ধ করে দেয়া হলো। আশেপাশে আরো যত শাখা ছিল, একে একে সবগুলো বন্ধ করা হলো। স্থানীয় যারা বিদেশীদের সাথে কাজ করত, তাদের সাথে সালেহ একান্তে মিলিত হলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হলো, তাদের মধ্যে যারা শিক্ষকতার কাজ করতো, আগের মতোই শিক্ষকতা দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে, তবে নতুন স্থাপিত বিদেশী স্কুলে নয়, গ্রামের আগের স্কুলেই! তাদের বেতনও ওখান থেকেই দেয়া হবে। আর বাকীদেরকেও বিভিন্ন দায়িত্ব দেয়া হলো!

✍

সবার মুখে এখন একটাই প্রশ্ন,

-গতরাতের আঁধারে বিদেশিনী কিভাবে গ্রাম ছেড়ে পালালো! নাকি এখানেই কারো বাড়িতে গোপনে লুকিয়ে আছে? ব্যাপারটা সবার কাছেই অমীমাংসিত রয়ে গেল!

সালেহ একবার ভাবলেন সবার কাছে বিষয়টা খুলেই বলবেন। পরে ভাবলেন, তরুণরা আবারও ক্ষেপে যেতে পারে! কয়েকদিন যাক! অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে আসুক! তখন দেখা যাবে।

✍

কয়েকদিন যাওয়ার পরও দেখা গেল, কয়েকজন যুবক এখনো মেয়েটাকে খুঁজছে! মেয়েটাও এখন বের হওয়ার ঝুঁকি নিতে চাচ্ছে না। সে দিব্যি সুবাইতার সাথে ভাব জমিয়ে ফেলেছে। ঘরের রান্নাবান্নাও দুজনে মিলে করছে! সালেহ কিছু বললেন না। একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকলে হয়তো

মেয়েটা স্বস্তিতে থাকতে পারবে! আর তিনি সারাদিন থাকেন বাইরে বাইরে! বিদেশিনীর কারণে সুবাইতাকে পড়াতে বসাতে পারছেন না। এতে তার ঘরে ফেরার প্রয়োজনও কমে গেলো। তিনি চাচ্ছিলেন, ইউনেস্কোর বিভিন্ন কার্যক্রম একেবারে বন্ধ হয়ে না যাক। বিদেশীরা থাকবে না, তবে তাদের কাজকে দ্বীনি পরিবেশে নিজেরা করতে পারলে ক্ষতি কি! তিনি সময় সময় গঠনমূলক চিন্তায় অভ্যস্ত!

✍

সবকিছু গুছিয়ে তুলতে প্রায় পনের দিন লেগে গেলো। বাড়িতে বেগানা মহিলা থাকার কারণে এদিকটাতে বেশি একটা আসা হয়নি। দূর থেকেই খোঁজ-খবর রেখেছেন। নিয়মিত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। সুবাইতাকে দিয়ে তার মায়ের জামা-কাপড় মেহমানকে পরতে দিয়েছেন। বাইরের কোনও লোক যাতে ভেতরে আসতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থেকেছেন!

✍

সালিহ এর মধ্যে ফোন নাম্বার সংগ্রহ করে রাবাত অফিসে যোগাযোগ করেছেন। জানিয়েছেন তাদের কর্মী নিরাপদে আছে। তবে এখন তাকে গ্রাম থেকে বের করা ঠিক হবে না। কথাও বলিয়ে দিয়েছেন মেহমানের সাথে। মহিলা পালিয়ে আসার সময় মোবাইলটাও সাথে নিয়ে আসতে পারেনি। ভাগ্যিস বুদ্ধি করে রাবাতে ফোন করেছিলেন। না হলে এতদিনে তোলপাড় হয়ে যেত! তাদের দূতাবাস থেকেও কেন বিষয়টা নিয়ে উচ্চবাচ্য করা হয়নি।

✍

পনের দিনের মাথায় তার মনে হলো, এখন মেহমানকে পাঠানো যায়। ঘরে ফিরে সুবাইতাকে দিয়ে খবর পাঠালেন। সুবাইতা ফিরে এসে বললো,

-তিনি আরো কয়েকটা দিন এখানে থেকে যেতে চান!

-এখানে এভাবে পড়ে থাকতে তার ভালো লাগছে?

-হ্যাঁ, তার নাকি খুব ভালো লাগছে!

-কিন্তু তাকে নিরাপদে গন্তব্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত যে আমি স্বস্তিতে থাকতে পারছি না! আচ্ছা ঠিক আছে, তিনি যখন নিজ থেকেই থেকে যেতে চাচ্ছেন, আমি মেযবান হয়ে কী করে মেহমানকে ঘরে থেকে বের করি!

কয়েক দিন পর আবারো সুবাইতাকে দিয়ে খবর পাঠালেন। এবার সরাসরি তার সাথেই কথা বলবেন বলে ঠিক করলেন। তিনি দরজার এপাশ থেকেই বললেন,

-আপনার যাওয়ার সব প্রস্তুতি সম্পন্ন! আমাকে বলা হয়েছে, আপনাকে মাহনি গেযেল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে! সেখানে আপনার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করবে। আমরা রওয়ানা হয়ে ফোন করলেই সেদিক থেকে গাড়ি আসবে!

-আমি আরো কয়েকটা দিন এখানে থাকতে চাই!

-আমার মনে হয়, আর থাকা ঠিক হবে না! আপনি পরিষ্কার করে বলুন তো, কেন আরো থাকতে চাচ্ছেন? আপনার আর কোনও ভয় নেই! পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে! কেউ এখন আপনার দিকে চোখ তুলেও চাইবে না। আর নিয়ে যাওয়ার সময় আপনাকে কেউ দেখবেও না। সেরকম ব্যবস্থা হয়েছে!

-আপনি যা বুঝেছেন, তা নয়! আমার এই ঘরে থাকতে সত্যি সত্যি ভালো লাগছে! আর সত্যি বলতে কি, সুবাইতাকে ছেড়ে যেতে আমার একদম ইচ্ছে করছে না।

-কিন্তু একসময় না একসময় আপনাকে তো যেতেই হবে!

-আচ্ছা, আমি এখানে যতদিন ইচ্ছা থাকতে পারি?

-না সেটা সম্ভব নয়! আপনি একজন ভিন্নধর্মের মেয়ে। তদুপরি এখানে থাকার কোনও কারণও দেখছি না!

-যদি থাকার মতো কোনও কারণ সৃষ্টি করা যায়?

-কিভাবে?

-আপনি কি বুঝতে পারেন সুবাইতা খুবই একাবোধ করে? তার একজন সঙ্গীর প্রয়োজন?

-ও আল্লাহ! আমি এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি! আপনি যা বলছেন, ভেবেচিন্তে বলছেন তো? আপনার সিদ্ধান্তটা বাহ্যিক দৃষ্টিতে কোনওভাবেই যৌক্তিক নয়!

-আমি যদি বলি, সবদিক থেকে যৌক্তিক করে তোলার জন্যে আমি মানসিকভাবে সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত?

-আমাকে ভাবতে দিন! এটা হুট করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কোনও বিষয় নয়! দেখতেই পাচ্ছেন! আমি একজন চল্লিশ পেরুনো মধ্যবয়স্ক লোক! আর

আপনি উচ্চশিক্ষিতা! ইউরোপের অভিজাত শ্রেণী থেকে উঠে আসা অল্পবয়েসী তরুনী!

-আমি গত দু'সপ্তাহে দীর্ঘ সময় নিয়ে এসব ভেবেছি! সবদিক ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি! এখন আপনি আমার অনুরোধটুকু রাখলে ভীষণ খুশি হবো! আমার জীবনটা বর্তে যাবে! আর একজন মানুষ আপনার উসিলায় হেদায়েত পাক, এটা তো নিশ্চয় আপনি চান?

-চাই, অবশ্যই চাই!

-তাহলে একথা জেনে রাখুন, আপনি রাজি না হলে, আমি সেই আগের চাকুরিতে ফিরে যাবো! সেটা মেনে নেয়া কি আপনার জন্যে উচিত হবে?

-আচ্ছা আপনি ঠিক কী দেখে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন?

-কারণ তো অনেক! সর্বশেষ যে বিষয়টা আমাকে চূড়ান্ত নিতে সহায়তা করেছে তা হলো, সুবাইতার আম্মার কামরা!

-সেখানে কী দেখলেন?

-কী অসম্ভব মমতায় কামরটা পরিপাটি করে সাজানো? অথচ মানুষটা কত আগে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে!

-এটা দেখে সিদ্ধান্ত নেয়ার কী হলো?

-সেটা আপনি বুঝবেন না!

-সুবাইতার কী হবে?

-তাকে আমি সব জানিয়েছি! সে এক কথায় রাজি!

-আচ্ছা, আমাকে একটু নিরালায় বসে ভাবতে দিন! নামাযের পরে এসে আমার সিদ্ধান্ত জানাব!

জীবন জাগার গল্প: ৫৮৮

ওমরের আবির্ভাব!

ঘরে ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেল। কাজে যেতে হয় গাযা-সীমান্তের ওপারে, কয়েকটা চেক পয়েন্ট পাড়ি দিয়ে। ঘর থেকে সময় নিয়েই বের হতে হয়। আসার সময়ও তাই। ইসরাঈলি সৈন্যরা খুবই কড়াভাবে সবকিছু তল্লাশী করে। বিরাট লাইন পড়ে যায়। দরজা খুলেই স্ত্রীর চিন্তিত মুখ দেখে অজানা আশংকায় বুক কেঁপে উঠলো। এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে পুরো গাযাবাসী সময় পার করে। শশব্যস্তে জানতে চাইলাম,

-কী হয়েছে?

উত্তর দিলো না। বাচ্চারা কোথায়? বলতে বলতে ভেতরে গিয়ে দেখি সবাই আছে। ছোটটার চোখে কান্নার দাগ। ও কেন কেঁদেছে? স্ত্রী ছেলেদের সামনে কিছু বললো না। টেনে পাশের কামরায় নিয়ে ঘটনা খুলে বললো। আমি বুঝতে পারলাম, আগের ঘটনা না জানার কারণে বাচ্চার মা কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। সে ঘটনার দ্বিতীয় অংশের মুখোমুখি হয়েছে। প্রথম অংশটা জানতে পারলে তার অস্থিরতা কমে আসবে!

আমার তিন সন্তান। তিনজনই প্রায় পিঠেপিঠি। আমাদের গাযায় সন্তান জন্মের হার বিশ্বের অন্যান্য স্থানের তুলনায় একটু বেশিই বলতে হবে। বড়জন আসমা। মেঝজন আয়েশা। ছোটটা উসামা। আমার খুব প্রিয় একটা শখ হলো তিনটা ছানাকে জড়িয়ে শুয়ে শুয়ে গল্প বলা। শত ক্লান্তিতেও এটা বাদ পড়ে না। এমনকি ইসরাঈলি বিমানের প্রচণ্ড হামলার রাতেও তাদেরকে গল্প শুনিয়েছি। এটা না করতে পারলে আমার কাছে মনে হতো সারা দিনের মূল কাজটাই হলো না। দিনটা অপূর্ণ থেকে গেলো। পরদিন মনের মধ্যে কিছু একটা খচখচ করে বিঁধতে থাকে।

বড়মেয়ে আসমা একটু বোকাটে। সে প্রতিদিনই এক গল্প শোনার বায়না ধরে। ইউসুফ (আ.) -এর গল্প। ছোট্ট ছেলেটাকে কূপে ফেলে দেয়া হয়েছে। বৃদ্ধ বাবা কাঁদতে কাঁদতে দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেছে। শুনতে শুনতে আসমার ডাগর ডাগর চোখ দু'টো আঁসুতে ভরে উঠতো। প্রতিদিনই। মেঝ মেয়ে আয়েশা একটু গম্ভীর প্রকৃতির। সেও প্রায় প্রতিদিনই মুসা (আ.) ও ফিরাউনের গল্প শোনার বায়না ধরে। ঈসা (আ.) -এর সেবার গল্প শুনতেও সে পছন্দ করে। তার মধ্যে পরোপকারের একটা ধাত আছে।

আর উসামা মিয়ার নিজস্ব বায়না নেই। আপুরা যা শুনতে চায় সেও চুপচাপ শুনে যায়। তার নিজস্ব পছন্দ চাওয়া-পাওয়া এখনো তৈরী হয়নি ভাল করে। প্রতিদিন দু'বোনের মন কষাকষি স চুপচাপ দেখে যায়। দুই আপুই নিজের পছন্দের গল্প শুনবে। এজন্য দু'জনকে খুশি করতে দুই গল্প এক সাথে শুরু করতে হয়।

গত রাতেও দুই আপুর বায়না দেখে উসামা চুপ করে ছিল। হঠাৎ করে সে বলে উঠলো,

-আমি ওমরের গল্প শুনবো!

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এর আগে কখনো ওমরের গল্প বলিনি তো! কোথায় শুনলো এই নাম?

-আপুকে পড়তে শুনেছি! তার স্কুলের বইয়ে আছে! তিনি নাকি বায়তুল মুকাদ্দাস জয় করেছেন! দুষ্ট লোকদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছেন এখান থেকে।

-আচ্ছা ঠিক আছে! তাহলে আজ ওমরের গল্পই হোক।

আমি প্রথমেই বললাম, এতিম বালকদের গল্প। মা রাতের বেলা চুলায় হাঁড়ি চড়িয়ে পানি গরম করছেন। বাচ্চাদের সান্ত্বনা দিচ্ছেন, এই তো রান্না হয়ে এল বলে! আসলে পাতিলে কোনও খাবার নেই। অনাথ শিশুগুলো খাবারের আশায় বসে রইল। অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়েও পড়লো।

-না খেয়েই আব্বু?

-হ্যাঁ রে বাবা! তাদের আব্বু নেই যে! তখন ওমর এই করুণ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। নিজে পিঠে করে খাবার নিয়ে এলেন। সবাইকে খাইয়ে তারপর বিদেয় হলেন।

গল্পটা শুনে উসামাও কাঁদলো। আয়েশা আরও গম্ভীর হয়ে গেলো। তার মন খারাপ হওয়ার ধরনটা একটু ভিন্ন। আসমার চোখ দিয়ে আঁসুর প্লাবন! এরপর মেয়েরাই আরেকটা গল্প শোনার বায়না ধরলো।

-আজ ঘুমিয়ে পড়ো। আগামীকাল আরও হবে ইনশাআল্লাহ।

পরদিন খেয়েদেয়ে গল্প বলার আয়োজন করতেই উসামা লাফিয়ে উঠে বললো,

-আজ আমিই গল্প শোনাবো!

-তাই? ঠিক আছে। বলো, শুনি!

উসামা গড়গড় করে গতকাল শোনা গল্পটাই দাড়ি-কমাসহ শুনিয়ে দিল। গতকালের গল্পবলিয়ে না কাঁদলেও আজকের গল্পবলিয়ে ঠিকই কাঁদলো। শ্রোতাদের মধ্যে আজ মা-ও ছিল। সেও কাঁদলো। এতিম বালকদের ক্ষুধার কষ্ট সেও সহ্য করতে পারেনি।

আজ গল্প বললাম, সেই কিবতী লোকের। আমর ইবনুল আস (রা.)-এর ছেলে যার প্রতি অসদাচরণ করেছিলেন। কিবতি মিশর থেকে মদীনায় এসে সরাসরি ওমরের কাছে নালিশ ঠুকলো। ওমর সাথে সাথে পিতা-পুত্রকে ডেকে পাঠালেন। বিচার শেষে রায় দিলেন। কিবতির হাতে লাঠি দিয়ে বললেন,

-তুমি তোমার ইনসাফ মতো আঘাত করো। মনে কোনও খেদ যাতে আর না থাকে!

এভাবে আমাদের গল্পবলার আসর বেশ জমে উঠলো। আমি একদিন গল্প বলি, পরদিন তিন ছানা-ছানি যে যার মতো গল্পটা বলে। বাচ্চাদের মা-ও আমাদের গল্পের রাজ্যে নিয়মিত সদস্য হওয়া শুরু করেছে। এভাবে আস্তে আস্তে ওমর (রা.)-এর তাকওয়া, সাহস, ন্যায়বিচারের গল্প বলা হয়ে গেলো একদিন উসামা আচমকা প্রশ্ন করলো,

-ওমর কি মারা গেছে আব্বু?

উত্তরটা এড়িয়ে গেলাম। অন্য কথা দিয়ে পাশ কাটালাম। গত এক মাসে ওমরের সাথে তার যে মানসিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে মারা গেছে বললে ছেলেটা ভীষণ আঘাত পাবে। তার চেয়ে পরে সময়মত বুঝিয়ে বললেই হবে।

কিন্তু পরদিন ওমরের গল্প শোনা শেষে আবারও আগের প্রশ্ন। আজও পাশ কাটালাম। না শোনার ভান করলাম। বুঝতে পারছিলাম ব্যক্তি ওমরের সাথে উসামার গভীর একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

উসামাকে স্কুলে ভর্তি করার সময় হয়ে গেছে। ঠিক হলো মায়ের স্কুলেই ভর্তি হবে। সেমতে মায়ের সাথেই স্কুলে রওয়ানা দিল। গাযায় গরীব দুঃখীর অভাব নেই। তীব্র অর্থনৈতিক অবরোধে জনজীবন ভেঙে পড়েছে প্রায়। রাস্তায় দুস্থ অসহায় মানুষের অভাব নেই। মায়ের হাত ধরে রাস্তায় বের হতেই দেখলো, এক বিপন্ন মা সন্তান কোলে নিয়ে খাবারের আশায় হাত পাতছে। উসামা দৃশ্যটা দেখেই চিৎকার করে বলে উঠলো,

-চিন্তা করো না, ওমর আসবে! খাবার নিয়ে। পেট পুরে খেতে পারবে!

বাচ্চার মা বিব্রত বোধ করে সেই মায়ের হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিয়ে দ্রুত স্থান ত্যাগ করলো। একটু পরে রাস্তার মোড়ে দেখলো এক বৃদ্ধ লোকের হাত থেকে রুটি ছিনিয়ে নিয়ে আরেক কিশোর পালিয়ে গেল। দৃশ্যটা উসামার দৃষ্টি এড়াল না। মায়ের হাত থেকে তার হাতটা ছাড়িয়ে দৌড়ে বৃদ্ধের কাছে চলে গেল। তাকে বললো,

-কোনও চিন্তা করো না। ওমরের কাছে বললে সব ঠিক করে দিবেন। উচিত বিচার করে দিবেন! লাঠি দিয়ে দুষ্ট ছেলেটাকে মারবেন!

সারাদিন স্কুলে ভালোই কাটালো। দুপুরে মায়ের সাথে ফিরলো। পাশের বাড়ির মহিলা অসুস্থ। তাকে দেখতে গেলো। টিভি চলছিল। টিভিতে দেখাচ্ছিল ইসরাঈলি সৈন্যরা বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রাঙ্গণ থেকে মুসল্লিদেরকে

হাঁকিয়ে বের করে দিচ্ছে। তাদের ছোঁড়া বুলেটে কয়েকজন নামাযী রক্তাক্ত হয়ে লুটিয়ে পড়লো! উসামার কাছে দৃশ্যটা বিসদৃশ মনে হলো স্বগতকণ্ঠে বলে উঠলো,

-এখুনি ওমর এসে ইহুদিদের আচ্ছা করে শাস্তি দেবেন!

প্রতিবেশিনী উসামার কথায় বেশ মজা পেলেন। সকৌতুকে বললেন,

-তুমি কোন ওমরের কথা বলছো বাছা?

-আমাদের খলীফা ওমর!

-তিনি তো মারা গেছেন!

ওমর মারা গেছেন একথা শোনার পর থেকে উসামা সেই যে কান্না শুরু করেছে। আর থামাথামি নেই। বড় বেশি ভালোবেসে ফেলেছিল। আমাকে দেখে উসামার শোক নতুন করে উথলে উঠলো। তার মনে ক্ষীণ আশা, আমার কাছে হয়তো ভিন্ন কিছু শুনবে। তাকে কোলে উঠিয়ে নিয়ে বললাম,

-হ্যাঁ, ওমর বিন খাত্তাব (রা.) মারা গেছেন। কিন্তু আরেকজন ওমর শিগ্রিই আসবেন!

-কোথায়?

-এই যে আমাদের ঘরেই! আর মাত্র ক'টা মাস পরেই!

-আমাদের নতুন ভাই?

-জি। তবে তুমিও চাইলে ওমর হতে পারো।

-কিন্তু আমার নাম তো উসামা!

-তাতে কী হয়েছে! তুমি ওমরের সাহসিকতা, ন্যায়বিচার, তাকওয়া অর্জন করতে পারো।

-তাহলে কি বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে ইহুদিদেরকে তাড়াতে পারব?

-অবশ্যই পারবে!

-তাহলে আমি আর ওমর, দুজনেই ওমর হবো!

-ইনশাআল্লাহ!

-আব্বু আমরা তো মেয়ে! আমরা কিভাবে ওমর হবো?

-তোমরা হবে ওমরের বোন! ওমরের মা। ওমরের লালন পালনকারিনী!

জীবন জাগার গল্প: ৫৮৯

রিয়া বিল কায়া!

প্রচণ্ড বিপদের মুখে, নিজের সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করে বাকিটুকুর জন্যে আল্লাহর মুখাপেক্ষী হওয়ার মধ্যে যে আনন্দ, পরিতৃপ্তি, নিশ্চয়তা আর পরম নির্ভরতা আছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝান মুশকিল।

এক.

অতি আদরের এক তালিবে ইলম এল। পেরেশান। অস্থির হয়ে আছে।

-হুযুর দু'আ চাইতে এসেছি!

-কেন?

-এই সপ্তাহের জুমার বয়ানটা নিয়ে অনেক মেহনত করেছি। কিন্তু কিছুতেই কথাগুলোকে একটা তারতীবে নিয়ে আসতে পারছি না। থেকে থেকে কথাগুলোর সুর কেটে যাচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ খেই হারিয়ে ফেলছি। মসজিদে যেতে মন সরছে না!

-তুমি কেন জুমা পড়াও?

-আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্যে!

-কেন বয়ান করো?

-নিজে শেখার আমলের নিয়তে। পাশাপাশি অন্যদেরও যেন কিছু উপকার হয়!

-তাহলে তোমার মনে যেন লোক দেখানো মনোভাব জায়গা না পায়। প্রশংসা বা খ্যাতি লাভের কুৎসিত মনোভাব যেন ধারেকাছেও ঘেঁষতে না পারে! তোমার সবকিছু হবে আল্লাহকে রাজিখুশি করার জন্যে। তিনি যদি তোমাকে মিম্বরে সবার সামনে লজ্জিত করার ফয়সালা করে থাকেন, তুমি সেটা নিয়ে শংকিত কেন হবে? আল্লাহ যা করেন তোমার-আমার ভালোর জন্যেই করেন, এই আকীদা কি তোমার নেই?

-জি আছে।

-তাহলে আর চিন্তা কি! যাও আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে, দুই রাকাত নামায পড়ে শুরু করে দাও। আমাদের কাজ হলো সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করা। তুমি কি সেটা করেছ?

-পুরো সপ্তাহ জুড়ে এই চেষ্টাই করি!

-আর কিছুর দরকার নেই। তোমার-আমার সীমা এটুকু ব্যাস। বাকিটুকু আল্লাহর। এ-চিন্তাটা মাথায় থাকলে দুশ্চিন্তা আসতেই পারে না!

দুই.

এটুকু লেখার পর এক পরিচিতজনের ফোন।

-খুবই সমস্যায় পড়ে গেছি। চাকুরি পাচ্ছি না কোথাও! যেখানে বর্তমানে আছি তাদের সবকিছু হালাল নয়। অনেক গোপন বিষয় আছে যা শরীয়তসম্মত নয়, আবার এদিকে অন্য কোন চাকুরিও খুঁজে পাচ্ছি না!

-কোথাও যোগযোগ করেছ?

-জি। কিন্তু লাগসই হচ্ছে না। ব্যাংকে সুযোগ আছে অবশ্য, কিন্তু সুদী ব্যাংকে জড়াতে চাচ্ছি না।

-তোমার সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করেছো বলে মনে করো?

-জি। চেষ্টায় কোনও কমতি রাখছি না। দু'আ করছি। সদকা করেছি। এদিকে বাড়িতেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। খুব শিগ্রি কিছু একটা না হলে, দুশ্চিন্তায় পাগল হয়ে যাব বলে মনে হচ্ছে!

-তোমাকে আগেও বলেছি এখনো বলছি, তুমি নিশ্চিন্ত মনে চেষ্টা করে যাও। বাকিটা করবেন আল্লাহ। এমনকি হালালের ওপর থাকতে গিয়ে যদি না খেয়ে মরতে হয় সমস্যা কোথায়? আল্লাহ যদি তোমার জন্যে এমনটা লিখে রাখেন তুমি হৃষ্টচিত্তে মেনে নিতে পারবে না কেন? তুমি আল্লাহর। তোমার সবকিছু আল্লাহর।

-বাবা মা?

-আগের কথাই! তুমি তো চেষ্টা করেছ। তারপরও কিছু না হলে তুমি কী করবে? হা-হুতাশ করে কিছুই হবে না। বান্দার কাজ চেষ্টা করা আর আল্লাহর কাছে দু'আ করে যাওয়া।

তিন.

হলবের এক বৃদ্ধ:

-আমাদের সবকিছু আল্লাহর কাছে বিক্রি করে দিয়েছি। তিনি কুরআন কারীমে এমনটাই করতে বলেছেন।

-আপনার ঘরবাড়ি সব বিধ্বস্ত, পুরো পরিবার শহীদ হয়ে গেছে। তাদের জন্যে কষ্ট লাগছে না?

-কষ্ট লাগাটা স্বাভাবিক! কিন্তু তারা আমার কাছে আল্লাহর পাঠানো আমানত ছিল। তিনি নিজের আমানত বুঝে নিয়েছেন। আমার আর কী বলার আছে?

-এত ধ্বংস, এত মৃত্যু দেখে কি মনে হয় না, সরকারের সাথে আপস করে নিলে ভালো হতো?

-আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে মাথা নত করতে চাই না। পুরো বিশ্বকে জানিয়ে দিতে চাই! আমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাড়া আর কাউকে নেতা হিশেবে মেনে নিতে রাজী না।

-অনেকেই তো দেশ ছেড়ে চলে গেছে। নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

-হালাবের মাটিই আমাদের মূল শক্তি। এটাকে কাফিরদের জন্যে ছেড়ে যেতে পারি না। আমরা চাই না এ ভূমি আল্লাহর যিকির থেকে খালি থাকুক। আল্লাহর কালিমা পাঠমুক্ত থাকুক। আমরা চাই না এ ভূমিতে কাফিরের পতাকা বুলন্দ হোক। পুরো হলব মাটির সাথে মিশে গেলেও আমরা নড়ছি না।

-ঘরবাড়ি ছাড়া, মাথার ওপর ছাদ ছাড়া?

-সেটা আল্লাহই দেখবেন। আমরা আমাদেরটা দেখি। আল্লাহ ছাড়া জীবনে আর কারো সামনে নত হইনি! হবোও না ইনশাআল্লাহ। আমার আল্লাহ যদি আমাদের এই পরিণতিতে খুশি থাকেন, আমি কেন তার খুশিতে খুশি হবো না?

জীবন জাগার গল্প: ৫৭০

মনোনয়ন

রাজা অতি বৃদ্ধ হয়ে গেছেন। প্রজাদের সেবা করেই সারাটা জীবন পার করেছেন। এখন পরপারে পাড়ি জমাবার সময় হয়েছে। কাকে সিংহাসনে বসিয়ে যাবেন এ নিয়ে দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

উত্তরসূরী বলতে শেষ বয়সে পাওয়া এক পুত্র সন্তান। কিন্তু রাজ্যপাট সামলানোর মতো যথেষ্ট বয়েসী হয়ে ওঠেনি। শিক্ষা বা ভাবনার বনেদ কোনটাই পোক্ত হয়নি। তিনি নিজে থেকে বসিয়ে গেলে প্রজারা কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধার কারণে কিছু বলবে না সত্য, কিন্তু অপরিপক্ক সন্তানকে এমন গুরুদায়িত্ব সঁপে গেলে তিলে তিলে গড়ে তোলা সাম্রাজ্য উচ্ছন্নে যেতে সময় লাগবে না।

প্রধান উযির রাজার মনের কথা পড়তে পারলেন। প্রস্তাব দিলেন,

-আমরা যুবরাজকে পরীক্ষা করে দেখতে পারি!

-কিভাবে?

-পরীক্ষার পদ্ধতিটা আমরা গোপন বৈঠকে পরামর্শ করে ঠিক করতে পারি।

-ঠিক আছে আজ রাতেই বৈঠক ডাকো! দেরী করা ঠিক নয়। কখন কী হয়ে যায়! রাজ্যের একটা হিল্লে করে পরম নিশ্চিন্তে দু'চোখ মুদতে চাই!

পরামর্শের পর যুবরাজকে জানিয়ে দেয়া হলো,

-তুমি পরবর্তী রাজা হতে চাইলে একটা কাজ করতে হবে!

-কী কাজ?

-চল্লিশ দিনের মধ্যে আকাশের সূর্যকে প্রাসাদে টেনে আনতে হবে! নইলে তোমাকে নির্জন কারাপ্রকোষ্ঠে বন্দী করে রাখা হবে। যাতে নতুন রাজার বিরুদ্ধে তোমাকে ব্যবহার করে কেউ কিছু করতে না পারে! আর উপায় বের করা পর্যন্ত তোমাকে একটি চারদেয়াল বেষ্টিত প্রাসাদে একাকী বাস করতে হবে।

-কিন্তু সূর্যকে কিভাবে প্রাসাদে আনবো? এটা তো সম্পূর্ণ অসম্ভব একটা কাজ!

-যেভাবেই হোক তোমাকে আনতে হবে!

যুবরাজ ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়লো। ভেবে চিন্তে রাজদার্শনিকের কাছে গেল।

-আমাকে একটা উপায় বাতলে দিন!

-নাহ, এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আছে।

যুবরাজ পরদিন ভোরে উঠেই পাহাড়ের চূড়ায় চলে গেল। চেষ্টা করে দেখবে সূর্য ছুঁয়ে দেখা যায় কি না। শীর্ষ শৃঙ্গে আরোহণ করেও কাজ হল না। গরমে মাথার চাঁদি ফেটে যাওয়ার উপক্রম। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। বিকেলে বিষণ্ণচিত্তে প্রাসদে ফিরে এল। বিফল মনোরথে মনস্কামনা অপূর্ণ রেখেই রাতে ঘুমুতে গেল। একটা দিন চলে গেল।

দরজা বন্ধ করে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ভাবনার অতলে হারিয়ে গেল। নির্ঘুম রাত কেটে গেল। এপাশ ওপাশ করে। পাশবদল করে। সকালে উঠে দরজার নিচে চিরকুট পেল। তাতে লেখা, দরজা বন্ধ করে ঘুমুলে সূর্য জীবনেও প্রাসাদে আসবে না।

পরদিন ছদ্মবেশে রাজ্যময় ঘুরে বেড়ালো। কোনও উপায় বের হলো না। তৃতীয় দিন ঘোষকের মাধ্যমে ঘোষণা দিল,

-সূর্যকে যে রাজপ্রাসাদে এনে দিতে পারবে, তার জন্যে রয়েছে আশাতীত পুরস্কার!

মিশ্র প্রতিক্রিয়া প্রজাদের মধ্যে এই ঘোষণা জন্ম দিল। একদল মনে করল, যুবরাজ পাগল হয়ে গেছে। এহেন অসম্ভব কল্পনা কোনও সুস্থ মানুষ করতে পারে?

আরেকদল মনে করল, যুবরাজ অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী। কর্মঠ। অসম্ভব কিছুর পেছনে তিনি দৌড়াবেন না তো কে দৌড়াবে? কিন্তু আখেরে ফল বের হলো একটাই। কোনও দলই সাহায্য করতে পারল না।

হতাশা চেপে বসতে শুরু করলো। আজ আর বের হতে মন চাইল না। কী হবে টো টো করে ঘুরে? রোদে পোড়াটাই যা সার! বিমনা হয়ে জানলার ধারে বসে ভাবছিল, হৈ চৈয়ের গজল্লায় চটকা ভাঙল। প্রহরীরা একজন বুড়োমতো লোককে দুরদুর করে তাড়াচ্ছে। বুড়োও যেন পণ করেছে, প্রাসাদের অন্দরে আসবেই! আমি যুবরাজের সাথে দেখা করতে চাই। তাকে সাহায্য করতে চাই!

-তুমি আদার বেপারী বুড়ো হাবড়া হয়ে কিভাবে যুবরাজকে সাহায্য করবে?

-তোমরা আমাকে বাধা দিচ্ছ। প্রাসাদে প্রবেশ করতে দিচ্ছ না। এই ছোট্ট এক বুড়োই যদি প্রাসাদে প্রবেশ করতে না পারে এতবড় সূর্য কিভাবে প্রবেশ করবে?

বৃদ্ধের কথাটা যুবরাজের মনে খট করে লাগল। তাড়াতাড়ি একজন লোক পাঠিয়ে বৃদ্ধকে নিয়ে আসতে বলল। কিন্তু বাইরে গিয়ে আর বৃদ্ধকে পাওয়া গেল না। হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে যেন। যুবরাজ হুকুম দিলো, পরে বৃদ্ধকে যেখানেই পাওয়া যাবে, তার কাছে যেন হাজির করা হয়! পরদিন আর বুড়োকে দেখা গেলো না। একটু আশার আলো যাও দেখা গিয়েছিল তাও নিভে গেলো। কিন্তু বসে থাকলে তো চলবে না। দিন ফুরিয়ে যাচ্ছে।

আবার কয়েকদিন বিষণ্ণতার মাঝে কেটে গেলো। এবার মাথায় একটা বুদ্ধি খেললো, সেটা বাস্তবায়ন করা গেলে সেদিনের বৃদ্ধকে পাওয়া যেতে পারে।

-প্রহরী! রাজ্যময় ঘোষণা দিয়ে দাও! শহরে হাঁটাচলায় সক্ষম এমন বৃদ্ধ মানুষেরা যেন নির্দিষ্ট তারিখে সন্ধ্যায় রাজপ্রাসাদে আসে। সবাই যেন সাথে

করে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে নিয়ে আসে। আর অন্য কেউ চাইলেও আসতে পারবে। তবে সম্মুখসারিতে থাকবে বৃদ্ধরা। উপস্থিত সবাইকে সম্মানিত করা হবে।

ঘোষণা দিয়ে দেয়া হলো। তারিখমতো মানুষ জড়ো হতে শুরু করলো। রাজ্যে আর কোনও বৃদ্ধ বাকি নেই। সবাই কৌতূহলে ফেটে পড়ছে যুবরাজ কী দিয়ে সম্মানিত করে? রাজপ্রাসাদের প্রধান ফটকে ভীড় গিজগিজ করতে লাগলো। এতগুলো মানুষ প্রবেশ কবতে পারছে না।

যুবরাজ হুকুম দিল, চারপাশের দেয়ালগুলো দ্রুত ভেঙে বৃদ্ধ মানুষগুলোকে সহজে ভেতরে আসতে দেয়া হোক। আর ভেতরের চত্বরে এত মানুষের সংকুলানও হবে না। যুবকেরাও এসেছে! সবাইকে জায়গা দিতে হলে দেয়াল ভাঙা ছাড়া উপায় নেই।

ভাল করে সন্ধ্যে নামতেই দেখা গেলো, চারদিক থেকে হাজার হাজার জ্বলন্ত মোমের মিছিল প্রাসাদমুখী। আলোর বন্যা বয়ে যাচ্ছে। যুবরাজ একান্ত প্রহরীদেরকে বললো সেদিনের বৃদ্ধকে বের করতে। কিন্তু এত লোকের মধ্যে একজন নির্দিষ্ট কাউকে বের করা অসম্ভব।

এমন অভিনব অবস্থা দেখে বৃদ্ধ রাজাও ছাদে উঠে এলেন। রাজদার্শনিককে ডেকে ছেলের সাথে কথা বলতে পাঠালেন। দার্শনিক এসে বললো,

-আপনি পরীক্ষায় পাশ করেছেন।

-কিভাবে? সূর্য তো আনতে পারিনি?

-তা পারেননি। তবে এমন কিছু করে দেখিয়েছেন, তাতে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হয়ে গেছে।

-কিভাবে?

-একজন পথ চলার সময় একটা মোম নিয়ে হাঁটে। তার আশেপাশে কিছুটা আঁধার দূর হয়। কিন্তু একসাথে অনেকগুলো মোম একসাথ হলে, অনেকটা জায়গা আলোকিত হয়। আপনি দেখুন! চারদিকটা মোমের আলোতে কেমন সূর্যের আলোর মতো আলোকিত হয়ে আছে!

-এতে লাভটা কী হয়েছে?

-অনেক লাভ হয়েছে!

ক) আপনার ডাকে এতগুলো মানুষ জড়ো হয়েছে। তার মানে তারা আপনাকে গুরুত্ব দেয়। মূল্যায়ন করে। সম্মান করে। ভালোবাসে।

খ) এতদিন লোকেরা রাজপ্রাসাদে আসতে ভয় পেত। নির্বিঘ্নে আসতে পারত না। বহির্প্রাচীর অন্তরায় হয়ে থাকত। কিন্তু আপনি তাদের জন্যে দেয়াল ভেঙে দেয়াতে আর কোনও আড় রইল না। সবাই আপনাকে আপন ভাবছে। তাদের জন্যে দেয়াল ভেঙে দিয়েছেন, এটা তাদের মনে থাকবে।

গ) দেয়ালের কারণে যেমন ভেতরে সূর্যের আলো আসতে পারত না, তদ্রূপ মানুষের ভালোবাসাও এই অবধি পৌঁছতে পারত না এখন সেটা উঠে গেছে।

ঘ) আপনি একা একা যখন সূর্য আনতে পারছিলেন না, জনগণের সাহায্য নিয়েছেন। আপনার মধ্যে সবাইকে নিয়ে কাজ করার একটা সহজাত ক্ষমতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এটা রাজামশাইকে বেশ আশান্বিত করে তুলেছে। এই গুণ ধরে রাখতে পারলে, আপনি কখনো জনবিচ্ছিন্ন শাসকে পরিণত হবেন না। ফলে রাজ্যটাও টিকে যাবে।

জীবন জাগার গল্প: ৫৯১

খেজুরে বউ

তখন আব্বাসি খেলাফত চলছে পূর্ণোদ্যমে। দামেশকের এক ব্যবসায়ী। তার দাবী ছিল, সে জীবনে কখনো ব্যবসায় মার খায়নি। যে ব্যবসাতেই হাত দিয়েছে, লাভের মুখ দেখেছে। বন্ধুরা বিশ্বাস করলো না।

-এ কী করে সম্ভব? একবারও তোমার ব্যবসায় মন্দা যায়নি?

-তোমাদের বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখতে পারো।

তখনকার যুগে ইরাক ছিল খেজুরের দেশ। চারদিকে খেজুর গাছে সয়লাব। চাইলে এমনিতেই খেজুর পাওয়া যেত। বাজারে বিক্রি করার কথা কেউ ভাবতেও পারত না। বন্ধু জব্দ করার জন্যে বললো,

-তুমি যদি ইরাকে খেজুর বিক্রি করে দেখাতে পার, তাহলে বুঝবো তুমি সত্য বলেছ।

-ঠিক আছে।

ব্যবসায়ী বন্ধু ইরাকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। ব্যবসার জন্যে কিছু খেজুরও সাথে নিল প্রয়োজন পড়লে ইরাক থেকে আরও খেজুর কিনে নিবে।

সেসময় আব্বাসি খলীফা ছিলেন ওয়াসেক বিল্লাহ। অবকাশ কাটাতে মুসল শহরে যাচ্ছিলেন। মুসল ছিল আব্বাসি খেলাফতের সুন্দরতম শহর। [বর্তমান

খেলাফতের ইরাক অঞ্চলের রাজধানীও এই মুসল। প্রচণ্ড মার্কিন-রাশিয়ান-সৌদি-তুর্কি-ইরানী-কুর্দি হামলার মোকাবেলা করছে। তখনকার যুগে মুসলকে বলা হতো 'দুই বসন্তের মা'। শীত ও গ্রীষ্মকাল উভয় মওসুমেই এখানকার আবহাওয়া আরামদায়ক থাকত। সেই মুসল এখন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছে।]

খলীফার সাথে তার মেয়েও গিয়েছিলেন। ফেরার পথে মেয়ের গলার হার হারিয়ে গেল। মেয়ের অত্যন্ত প্রিয় হার। মন খারাপ থেকে খলীফা ঘোষণা দিলেন,

-হারটা যে এনে দিতে পারবে তার জন্যে বিরাট পুরষ্কারের ব্যবস্থা থাকবে!

সবাই মনে করলো এই সুযোগ, ভাগ্য ভাল হলে খলীফার জামাই হয়ে যাওয়াও বিচিত্র কিছু নয়। হারের খোঁজে বেরিয়ে পড়লো বাগদাদের মানুষ। যুবকের দল। দিমাশকের খেজুর ব্যবসায়ী তখন খেজুর পণ্য নিয়ে শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছেছে। হার অনুসন্ধানী দল নগরপ্রাচীরের বাইরে বুঝতে পারলো হার খুঁজতে হলে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হবে। কারণ বাগদাদ থেকে মুসলের দূরত্ব কম নয়। মাথার ওপর কড়া রোদ্দুর। নীচে তপ্ত বালু। বেশির ভাগ মানুষই সাথে করে পাথেয় নিয়ে আসেনি। খেজুর ব্যবসায়ী দেখলো এই তো সুযোগ। ঘোষণা দিল,

-এখানে সুলভ মূল্যে উৎকৃষ্টমানে খেজুর পাওয়া যায়

লোকজন হুমড়ি খেয়ে পড়লো। জীবনে খেজুর কিনে না খেলেও, খলীফাকন্যার হারের মোহে পড়ে কিনতে বাধ্য হলো। নিমেষেই বিক্রি হয়ে গেল সব খেজুর ।

বাগদাদের মানুষও খেজুর কিনে খায়! খবরটা চারিদিকে বেশ চাউর হয়ে গেলো। খলীফার কানে যেতেও দেরী হলো না। তিনি বেশ কৌতূহলী হয়ে দিমাশকের ব্যবসায়ীকে ডেকে পাঠালেন। তিনি তখনো বাগদাদে প্রবেশ করেননি। মেয়ের হারটা পাওয়া গেলে ওটা নিয়েই প্রবেশ করবেন এই ছিল তার ইচ্ছা।

-বাগদাদে কিভাবে খেজুর বিক্রি করলে?

ব্যবসায়ী পুরো ঘটনা খুলে বললো। খলীফা চমৎকৃত হলেন।

-জীবনে একটিবারও ব্যবসায় মার খাওনি! এর কারণ কী?

-আমার মনে হয় মায়ের দুআ ইয়া আমীরাল মুমিনীন!

-তাই নাকি?

-জি। যখন জন্মগ্রহণ করি, আব্বু তখন বেঁচে নেই। আম্মু ছিলেন পঙ্গু মানুষ। নিজে নিজে হাঁটাচলা করতে পারতেন না। সেজন্য পাড়া-পড়শির দয়া-দক্ষিণায় আমি বড় হয়েছি। আমার বয়স যখন পাঁচ তখন থেকেই আমি রুজি-রোজগারে নেমে পড়েছিলাম। আমি জ্ঞানতঃ মাকে কষ্ট দেইনি। কষ্ট করতে দেইনি। তার সবকিছু ধরে ধরে করাতে হত। সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। হাসিমুখেই মায়ের সেবা করেছি। সারাদিন পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করেছি। ফাঁকে ফাঁকে মায়ের সেবাও করেছি। আম্মু মারা যাওয়ার সময় আমার জন্যে কেঁদে কেঁদে দু'আ করে গিয়েছিলেন,

ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলেকে দীন ও দুনিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করো।

ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলের জন্যে যুগের সবচেয়ে সম্মানিত ঘর থেকে জোড়া জুটিয়ে দিও!

ইয়া আল্লাহ! আমার ছেলের হাতে মাটিকেও স্বর্ণে পরিণত করে দিও!

খেজুর ব্যবসায়ী খলীফাকে বললো,

-মায়ের দু'আর বরকতে যেখানেই হাত দিয়েছি বরকত পেয়েছি। এই ইরাকের মাটিতে খেজুর হয়।

এটুকু বলে উদাহরণ দেয়াার জন্যে উবু হয়ে এক মুষ্ঠি মাটি নিয়ে বললো,

-এমন খেজুর জন্মানো মাটিতেও আল্লাহর রহমতে আমি খেজুর বিক্রি করেছি।

কথা শেষ করে ব্যবসায়ী অনুভব করলো, হাতে তুলে নেয়া মাটির সাথে শক্ত কী যেন উঠে এসেছে। অবাক হয়ে দেখল, একটা অনিন্দ্য সুন্দর হার। খলীফার মেয়ে এতক্ষণ তাঁবুর ভেতর থেকে বাবা আর সওদাগরের কথোপকথন শুনছিল। তার চোখ পড়লো হারটার ওপর।

-ইয়া আল্লাহ! এ যে দেখি খোয়া যাওয়া হার!

খলীফা ওয়াসেক বিল্লাহ এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে সওদাগরের জীবনগাঁথা শুনছিলেন। মেয়ের চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেলেন। সাথে সাথে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাসও ফেললেন।

-মেয়ের ভবিষ্যত নিয়ে আর চিন্তার কিছু নেই! আল হামদুলিল্লাহ!

জীবন জাগার গল্প: ৫৭২

নবীজির ঘ্রাণ!

আসআদ তৃহা। একজন আরব সাংবাদিক। ফ্রি-ল্যান্সার। সৃজনশীল তথ্যচিত্র নির্মাতা। পেশাগত কারণেই ঘুরে বেড়ান বিশ্বের নানা প্রান্তে। এমাথা-ওমাথায় চষে বেড়ান। মুসলিম অধ্যুষিত প্রায় প্রতিটি অঞ্চলই তার ঘোরা হয়ে গেছে। বিশেষ করে সংখ্যালঘু মুসলিমদের অঞ্চলগুলোর তার বিশেষ দুর্বলতাও আছে। একটা লেখায় তিনি খণ্ড খণ্ড চিত্রে কিছু চিন্তা ও পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেছেন।

(এক)

সালটা ১৯৯৩। গ্রীষ্মের মাঝামাঝি। বসনিয়া হার্জেগোভিনার মুসলমানদের ওপর নির্বিচারে গণহত্যা চালাচ্ছে সার্বিয়ানরা। আত্মরক্ষার তাকিদে, ভিটেমাটি ছেড়ে অসহায় মানুষগুলো পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিয়েছে। ক্রোয়েশিয়ার রাজধানীতেও বেশ কিছু পরিবার গিয়েছে। রাস্তার দু'পাশে তাঁবু গেঁড়ে তারা বাস করছে।

এক আরব যুবক তাদের অসহায় অবস্থা দেখে ছুটে গেল। অনেক টাকা-পয়সা নিয়ে। অকুস্থলে গিয়ে সে অবাক! নিপীড়িত মানুষগুলোর পোশাক-আশাক তাকে ভীষণভাবে নাড়া দিল! খ্রিস্টানদের সাথে তাদের কোনও পার্থক্য নেই। মুসলিম তরুণীরা খাটো খাটো স্কার্ট পরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথায় কিছু নেই। যুবকের দল কারো মধ্যেই ইসলামের নাম-গন্ধ নেই।

সে একবার ভাবল টাকাপয়সা যা নিয়ে গেছে, সেটা না দিয়েই ফিরে আসবে। এরা কেমন মুসলমান! এহেন বিপদেও ধর্মকর্মে মতি নেই? আরেকটা চিন্তাও তার মাথায় এল,

-সার্বিয়ান পশুগুলো এই মুসলমানদেরকে কেন মারছে? এরা তো প্রায় তাদের মতই! তবে কি কোনওরকম নামধারী মুসলমান হওয়াটাই তাদের একমাত্র অপরাধ? এই নামমাত্র ইসলামও খ্রিস্টানদের কাছে অসহ্য মনে হচ্ছে? তারা নামমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে এদেরকে মারতে পারলে, আমি নামমাত্র মুসলমান হওয়ার কারণে তাদেরকে সাহায্য করতে পারব না কেন?

(দুই)

তিরানায় গিয়েছিলাম। আলবেনিয়ার রাজধানী। আনোয়ার হোজ্জার কমিউনিস্ট শাসন দেশটাকে ঝাঁঝরা করে ফেলেছিল। ব্যক্তিমালিকানাধীন কোনও সম্পদ ছিল না। সবকিছুকে রাষ্ট্রায়ত্ত করে নেয়া হয়েছিল। ইসলাম ধর্ম পালন নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। বহু ইসলামি নিদর্শন মুছে ফেলা হয়েছিল রাজধানীর প্রধান মসজিদটা কী মনে করে হোজ্জা বহাল রেখেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই বোধ হয়। আমি মসজিদ দেখতে গেলাম। দেশের প্রধান মুফতি শায়খ সাবরী কুতশি সদ্য কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। বিশ বছর অন্তরীন থাকার পর। তিনি দু'জন মানুষ সহ যোহরের নামায পড়ছেন। মসজিদ চত্বরে দর্শনার্থী গিজগিজ করছে। সবাই সামাহীন বিস্ময় নিয়ে শায়খ ও তার দুই সঙ্গীর নামায দেখছিল। তারা বুঝে উঠতে পারছিল না, মানুষগুলো এভাবে ওঠবস করছে কেন? নামাযীরা যেন ভিনগ্রহ থেকে নেমে আসা কোনও প্রাণী!

দীর্ঘদিন ইসলাম থেকে দূরে থাকার কারনে তারা নামায-কালাম প্রায় ভুলতে বসেছিল। একটা ব্যাপার লক্ষ্যণীয় ছিল। তারা সবকিছু ভুলে গেলেও, তারা যে মুসলিম, শত নির্যাতন সত্ত্বেও একথা তারা ভোলেনি। ঠিকই মনে রেখেছে। আমি অনেকের সাথে ব্যক্তিগতভাবে কথা বলে জেনেছি: তাদের অনেকের ঘরের কিছু দেয়াল ফাঁপা! সেখানে বাপ-দাদারা কুরআন-হাদীসের কিতাবপত্র লুকিয়ে রেখে গেছে। অনেক ঘরে এমনও হয়েছে: দেয়াল ভেঙে দেখা গেছে কিছু আরবী পত্র-পত্রিকা রাখা আছে! ইসলামের প্রতি, কুরআনের প্রতি ভালোবাসা এতটাই গভীর ছিল, নিছক আরবী ভাষাও তাদের কাছে সম্মানযোগ্য আর বরকতময় মনে হয়েছে। আদর-যত্ন দিয়ে গোপনে লুকিয়ে রেখেছে! তাদের জানা ছিল, কুরআনের ভাষা আরবী। প্রিয় নবীজির ভাষা আরবী. তাই আরবী ভাষাকেও ভালোবাসা চাই! শ্রদ্ধা করা চাই!

(তিন)

সারায়েভোতে যুদ্ধ চলাকালে দেখেছি, একটা রেডিও স্টেশনে আরবী গান বাজানো হচ্ছে। কুরআন কারীমের একটা রেকর্ড ছিল ওটা বাজানো হত। কিভাবে যেন কয়েকটা আরবী গানের রেকর্ড সংগ্রহ করেছিল, সেগুলোই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সম্প্রচার করা হত। তারা মনে করত, আরবী ভাষা হলেই হয়েছে। শুনলে সওয়াব হবে। কুরআনের ভাষা যে আরবী? নবীজি যে আরবীতে কথা বলতেন!

(চার)

কমিউনিস্টরা কী অসম্ভব নির্যাতন চালিয়েছে, বলে বোঝানর মতো নয়। ধর্মের প্রতি তাদের সেই পাশবিক খড়্গহস্তের কথা জানতে পারলে, দূর থেকে যে কেউ মনে করবে, সেসব অঞ্চলে বোধ হয় ইসলামের নাম-গন্ধও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো!

✍

ইউক্রেনের উত্তর প্রান্তে ঘুরতে গিয়ে এক তাতারী বৃদ্ধার সাথে কথা বলার সুযোগ হয়েছিল। তার কথা শুনে আমি দীর্ঘক্ষণ কোনও কথাই বলতে পারিনি! নিজেকে ধিক্কার দিয়েছি! আমাকে সেই বৃদ্ধার জুতার তলা হওয়ারও যোগ্য মনে হয়নি! তিনি বলেছিলেন,

-স্ট্যালিন এসে আমাদের ওপর জুলুমের পাহাড় চাপিয়ে দিল। পুরো এলাকাকে তছনছ করে দিল। আমরা ভিটেমাটি আর সহায়-সম্পত্তি খুইয়ে খোলা আকাশে এসে দাঁড়ালাম। এটাও তার সইল না। হাতের পোঁটলা-পুঁটলিতে যা কিছু ছিল সেটাও কেড়ে নেয়া হল। সবাইকে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়ার হলো সাইবেরিয়ার বিন্দানখানায়! যেখানে মানুষ জীবিত প্রবেশ করে, মৃত হয়ে বের হয়।

দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে পাড়ি দিতে হয়েছে। একে একে সবকিছু হারিয়েছি। কিন্তু এই যে কুরআনখানা দেখছ, সেটা কিছুতেই হাতছাড়া হতে দেইনি! একান্ত শৈশবে দাদুর কাছ থেকে পাওয়া কুরআনের মূল্য আমার কাছে জীবনের চেয়ে লক্ষ-কোটি গুণ বেশি! বালিকাবেলায় কাছছাড়া করিনি। যৌবনে স্বামীর ঘরেও কুরআন ছিল আমার নিত্যসঙ্গী। সাইবেরিয়ার কনকনে প্রাণসংহারী ঠাণ্ডাতেও কুরআনখানা আমার বুকছাড়া হয়নি! এই কুরআন ছিল আমার প্রাণভোমরা! আমি নিশ্চিত জানতাম, এই কুরআন কোনও ভাবে আমার হাতছাড়া হলে, আমি বাঁচব না। শোকে-দুঃখে মারা পড়তাম! এই কুরআনকে ঘিরে অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে! আমার স্বামী দুষ্টমি করে বলতেন,

-এতদিন জানতাম নারীদের সতীন হয়, এখন দেখছি, পুরুষেরও সতীন হতে পারে!

(পাঁচ)

মধ্য এশিয়ার ঘটনা বড় আজীব। দীর্ঘদিন ধরে ইসলামের নামগন্ধও ছিল না সেখানে কমিউনিজমের লৌহকঠিন শাসনে ধর্মকর্মের কোনও স্থান ছিল না।

কিন্তু যেই না কমিউনিজম মুখ থুবড়ে পড়ল, সাথে সাথে মরুভূমির ঘাসের মতো ইসলাম আবার লকলকিয়ে বের হয়ে এল।

এক যুবকের সাথে কথা হয়েছিল। সে জানাল,

-কোনওভাবেই দীন পালন করার সুযোগ ছিল না। তাসবীহ দেখলেই গ্রেফতার করত। কপালে দাগ দেখলে গ্রেফতার করত। আমাদেরকে কুরআন শিক্ষা দেয়া হত অত্যন্ত গোপনে। মাটির নীচে গোপন প্রকোষ্ঠে। মুরুব্বীরা বলতেন, আমরা তো কমিউনিজমকে পরাজিত করতে পারলাম না। আমাদের সন্তানরা যেন পারে, সে চেষ্টা করছি। আমরা নিজেরাই দীন সম্পর্কে বেশি কিছু জানি না। সন্তানদেরকে কী শিক্ষা দেব? তবে এই দুর্দিনে কুরআন শিক্ষা দেয়া তুলনামূলক সহজ! সেটাই করার চেষ্টা করছি! না বুঝে হলেও, কুরআন পড়া শিখে গেলে, কুরআন মুখস্থ করতে পারলে, কুরআনই তাদেরকে ভবিষ্যতে পথ দেখাবে। হেদায়াতের কাছে নিয়ে যাবে। শত নির্যাতনেও গোমরাহ হতে দেবে না। কুরআন শুধু একটা পাঠ্যবইই নয়, কুরআন একটা মুজিযাও বটে! কুরআন যেহেতু লওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আছে, কুরআনকে ধারণকারীর ঈমানও নিশ্চয় সেরকম মাহফুজ থাকবে!

= এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরেই বড়রা আমাদেরকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। দীর্ঘকাল ধর্মপালন থেকে বঞ্চিত থাকার পরও আমরা যে এখনো মুসলমান আছি, এটাই প্রমাণ করে, কুরআন আসলেই একটা জীবন্ত মুজিযা! বিধিবিধান দেয়ার বাইরেও কুরআনের একটা আলাদা শক্তি আছে! মধ্য এশিয়ার মুসলমানরা নয়, কমিউনিস্টদেরকে হারিয়েছে আসলে এই কুরআন! নীরবে ঘাতকের কাজ করেছে। কুরআন নিজে কাফিরদেরকে মারতে বলে না, নিজেও অদ্ভুত উপায়ে কাফিরেদেরকে মারে! কুরআন আল্লাহরই একটা অংশ! কাগজে লেখা কুরআনের কথা বলছি না, লওহে মাহফুজে থাকা মূল কুরআনের কথা বলছি!

(ছয়)

সারায়েভোর অদূরে এক মহল্লায় গিয়েছিলাম। যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে গেছে। এক মসজিদের সামনে গিয়ে দেখি একজন মানুষ বসে আছেন। সর্বাঙ্গ চাদর মুড়ি দেয়া। ঠকঠক করে কাঁপছেন। অবাক হলাম! মাথার ওপর ফকফকা রোদ! গরমও আছে!

-আপনার কি শীত লাগছে?

-জি!

-এই গরমের মধ্যেও!

-আমি খুবই অসুস্থ! প্রচণ্ড জ্বর!

-এখানে বসে আছেন কেন?

-আমার ছেলেটা ভেতরে কুরআন পড়তে গেছে! তার পড়া শেষ হওয়ার অপেক্ষা করছি!

-বাড়ি চলে গেলে ভাল হত না!

-একা একা যেতে পারবে না! আবার এটাও চাই না, তার কুরআন-পড়ায় ব্যঘাত ঘটুক!

-আজ অসুস্থ শরীরে না এলেই পারতেন!

-না না, আমি নিজে কুরআন শিখতে পারিনি! ভাল মুসলমান হতে পারিনি! আমি চাই না, আমার সন্তানও আমার মত হোক!

(সাত)

উজবেকিস্তানের ঘটনা। একটা অনুসন্ধানী রিপোর্ট তৈরী করতে গিয়ে পরিচয় হলো তার সাথে। কথায় কথায় অনেক কিছুই জানতে পারলাম। চোখ বড় বড় করে গড়গড় করে জীবনের সেই দুঃসহ স্মৃতিগুলো বলে যাচ্ছিল।
-আমরা স্কুলে যেতাম। রোজার দিনেও স্কুল বন্ধ রাখার জো ছিল না। রোজা রাখার তো প্রশ্নই নেই। গ্রামে কেউ রোজা রেখেছে জানতে পারলেই হয়েছে। সাথে সাথে লালবাহিনী এসে পুরো গ্রাম ঘিরে ফেলত!
স্কুলে বিনামূল্যে খাবার দিয়ে পরীক্ষা করা হত, কে কে খাচ্ছে না! কেউ না খেলেই ধরে নেয়া হত, সে রোজা রেখেছে। ব্যাস! সাথে সাথে তার ঘরে লালবাহিনী হাজির! তারপরের কথা আর না বলাই ভালো!

আমার আম্মু ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ মহিলা। তিনি আমাদেরকে শিক্ষা দিতেন কিভাবে স্কুলে গিয়ে নামাজ পড়ব!

-বাছা! নামাজের সময় হলে দেরী করবে না।

-কিভাবে? স্যার ক্লাসে থাকেন যে!

-তা থাকুন! উনি যখন বইয়ের দিকে তাকাবেন, তুমি চট করে আল্লাহু আকবার বলে ফেলবে। তবে অপেক্ষা করবে কখন তিনি ব্ল্যাকবোর্ডে লিখতে শুরু করেন। মনে মনে সূরা-কেরাত পড়বে। চেষ্টা করবে মাথা উঁচু-নিচু করে নামায পড়তে! তাও যদি না পার, শেষ চেষ্টা হিশেবে ভ্রুকে উপর-নিচ করে

নামায পড়বে! রুকুর জন্যে একটু কম ঝোঁকাবে, সিজদার জন্যে বেশি। এভাবে নামায পড়লে আদায় হবে কি না জানি না! তবুও একেবারে না পড়ার চেয়ে, স্মরণে রাখার জন্যে, নাম কা ওয়াস্তে হলেও পড়া ভালো মনে করি! পরে বাড়ি এসে কাযা আদায় করে নিবে! কোনও অবস্থাতেই নামায ছাড়বে না!

(আট)

দাগেস্তানের সংবাদ কভার করার জন্যে গেলাম। জানতে পারলাম, তারা সন্তানদেরকে দীর্ঘদিনের জন্যে পাহাড়ের গোপন গুহায় পাঠিয়ে দিতো। হাফেজ হওয়ার আগে আর ফিরিয়ে আনত না। খাবার-দাবার গুহার ফোকর দিয়ে রেখে আসতো! রাশান বাহিনীতে ফাঁকি দেয়ার জন্যে আরও কতো যে কৌশল তারা অবলম্বন করত তার শেষ নেই। যিনি শিক্ষক হতেন, তিনিও সেই নির্জন গুহায় মাসকে মাস পড়ে থাকতেন! বউ-বাচ্চা ছেড়ে!

এসব শুনে আমার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে হলো। একজন আরব হয়েও আমি এখনো কুরআনে হাফেজ হতে পারলাম না। অথচ তারা আরবী না বুঝেও কুরআনের কী কদর করছে! শত বাধা সত্ত্বেও কুরআনকে আঁকড়ে ধরে থেকেছে!

(নয়)

দীর্ঘদিন কমিউনিস্ট শাসনে থেকে, অধিকাংশ মানুষ কুরআন পড়তে পারত না। আরবীর সাথে তাদের সম্পর্ক ছিল না। তবুও শুধু আরবীর প্রতি তাদের কী অগাধ ভক্তি! না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল!
সেবার হজ্জ করার ইচ্ছে হল। সব ব্যবস্থা সেরে একটা কাফেলায় জুটে গেলাম। মক্কায় হেরেম শরীফের দোতলায় বসে বসে কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। একটু পরে খেয়াল করলাম, আমার অদূরে দুজন মানুষ আমার দিকে কেমন যেন ঘোর লাগা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। একজন বৃদ্ধ আরেকজন বৃদ্ধা। স্বামী-স্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।
ব্যাপারটাকে বেশি গুরুত্ব না দিয়ে তিলাওয়াত চালিয়ে গেলাম। কিন্তু কেউ আমার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে আছে, এটা যে কারো জন্যেই বেশ অস্বস্তিকর! একটু পরে দৃষ্টি থেকে বাঁচার তাগিদে কুরআন কারীম বন্ধ করে উঠে গেলাম। হঠাৎ করে কিছু বুঝে ওঠার আগেই, বৃদ্ধ দম্পতি চিলের মতো আমার দিকে ছুটে এল। দুজনে আমার দুহাত টেনে নিয়ে পাগলের মতো চুমু

খেতে শুরু করলো! সম্বিত ফিরে পেয়েই হাত জোর করে ছাড়িয়ে নিলাম! তাদের এই বিস্ময়কর আচরণের কারণ অনুসন্ধানে ব্রতী হলাম। দু'জনেই মধ্য এশিয়ার লোক! ভাঙা ভাঙা ভাষায় যা বললো তার অর্থ দাঁড়াল এই,
-আমরা জীবনে কাউকে কুরআন পড়তে দেখিনি! আজই মক্কায় এসেছি! এখনে দেখি সবাই কুরআন পড়তে পারে! আমাদের ধারণা ছিল অল্প কিছু মানুষেরই শুধু কুরআন পড়ার সৌভাগ্য হয়। এবং এবং এটা আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহেই তারা পারেন। তারা আল্লাহর নির্বাচিত বান্দা! আপনিও তাদের একজন! এজন্য কুরআন পড়তে পারি না। আপনার মতো একজন নির্বাচিত বান্দার হাতের বরকত লাভে নিজেদেরকে কিভাবে বঞ্চিত করি! আমরা দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছি! আর বেশিদিন বাঁচবো সে আশা নেই! কুরআন পড়তে শেখাও আর ইহজীবনে হবে না! আপনাদের মতো কুরআন পড়তে জানা মানুষ দেখাই জীবনের অনেক বড় পাওনা! বিরাট বড় সওদা!
আমি কী বলবো বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মনে মনে লজ্জায় মরমে মরে যাচ্ছিলাম। আমি যে কেমন মানুষ, সেটা যদি এই বৃদ্ধ-দম্পতি টের পেত, হস্তচুম্বন তো দূরের কথা, জুতা ছুঁড়ে মারতেও দ্বিধা করত না!

(দশ)
পত্রিকার দপ্তর থেকে বলা হলো ফিলিপাইন যেতে হবে। মরো মুসলিম লিবারেশন ফ্রন্টের বাস্তব অবস্থা জানতে। মিন্দানাও দ্বীপে! সরকারী কর্তৃপক্ষ আর স্বাধীনতাকামীদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের কারণগুলো কী কী সেটা ভালো করে জানতে হবে। এক ফিলিপাইনি ছাত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতাকামীদের একটা সোর্সের সাথে যোগাযোগ হলো।
ম্যানিলায় বিমান থেকে নেমে, নিজেকে সোর্সের হাতে ছেড়ে দিলাম। আমার চোখে পট্টি বেঁধে দেয়া হলো। গাড়ি এগলি সেগলি ঘুরে অনেকক্ষণ পর একটা তীরবর্তী বাড়িতে গিয়ে থামলো। তখনো রাত নামেনি। খাওয়া-দাওয়ার পর সামান্য বিশ্রাম নিতে বলা হল। রাত গভীর হলে বোটে করে রওয়ানা দেয়া হবে।
একজন এসে বড় সম্মানের সাথে ঘুম ভাঙালো। রাত তখন বারোটা। আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলাম। ঘুম তাড়ানোর জন্যে এককাপ চা দেয়া হলো। চা-টুকু খেয়ে ঝটপট বোটে উঠে পড়লাম। বোট চলতে থাকলো একটানা। এক গভীর বনের মধ্যে একটা খাঁড়িতে গিয়ে বোট দাঁড়ালো। এবার শুরু হলো পায়ে হাঁটা। গন্তব্যে পৌছতে পৌছতে সন্ধ্যে ছুঁই ছুঁই! কমান্ডার এসে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরলেন। আরবী বলতে পারেন। বিশুদ্ধ ভাষায়।

হালকা নাস্তা সারার পর, কমান্ডার আমাকে নিয়ে ক্যাম্পের মসজিদে গেলেন। সেখানে সাধারণ সৈনিকদের পাশাপাশি কাছেপিঠের কিছু বেসামরিক গ্রামবাসীও ছিল। সৈনিকেরা শৃঙ্খলা বজায় রেখেই পরম আন্তরিকতার সাথে মোসাফাহা করলো। এবার গ্রামবাসীদের পালা। অবস্থা দেখে মনে হলো, তাদেরকে যেন এতক্ষণ কিছু একটার সাথে বেঁধে রাখা হয়েছিল! সবাই এমনভাবে আমার দিকে তেড়েফুঁড়ে এল, রীতিমত ভয়ই পেয়ে গেলাম।

কেউ এসে আমার হাতে চুমু দিতে শুরু করলো। কেউ গালে। কয়েকজন আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার গা শুঁকতে শুরু করলো। আমি অবাক হয়ে পাশে দাঁড়িয়ে থাকা কমান্ডারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম! তিনি আমার মনোভাব বুঝতে পেরে ভিজে গলায় বললেন,

-ওদেরকে বাধা দিবেন না। তাদের আবেগ প্রশমিত হতে দিন!

-কিসের আবেগ?

-তাদের বিশ্বাসঃ আমাদের পেয়ারা নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরবের লোক! আপনিও যেহেতু আরবদেশ থেকে এসেছেন, আপনার শরীরে নবীজির সুবাসমাখা আরবের আলো-বাতাস লেগেছে! তারা সেটাই আপনার শরীরে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে! আন্দাজ করার চেষ্টা করছে নবীজির ঘ্রাণ কেমন হতে পারে!

জীবন জাগার গল্পঃ ৫৯৩

দুআর বরকত!

তখনো দক্ষিণ সুদান আলাদা হয়নি। দারফুরে অসন্তোষ থাকলেও বিদ্রোহের আগুন এতটা জ্বলে ওঠেনি। বিভিন্ন দেশের পর্যটকদের আগমন আমাদের দেশে লেগেই থাকতো। আমাদের দোকানটা ছিল খার্তুমের পূর্ব প্রান্তে। খুব জমজমাট না হলেও, নিয়মিত কিছু বাধাধরা খদ্দের ছিল। তারা আমাদের রান্না পছন্দ করত। প্রতি রাতেই বেশ কিছু শ্রমিক এখানে রাতের খাবার সারত। দূরে এক খনিতে কাজ করে ফেরার পথে ট্রাক থামিয়ে তারা খাওয়ার পর্ব সেরে যেত। আবার সকালে যাওয়ার সময় অতি ভোরে নাশতাও সেরে যেত। কোম্পানীই তাদের খায়-খরচা বহন করত। নগদ বিক্রি। লেনদেন সাফ। দিয়ে-থুয়েও বেশ লাভ থাকত।

অন্যদিনের মতো সেদিনও আমরা রাতের রান্না চড়িয়ে দিলাম। প্রায় হয়ে এসেছে। এমন সময় চারদিকে প্রবল বাতাস বইতে শুরু করল। সাথে বালুঝড়। দোকানপাট ফটাফট বন্ধ হতে শুরু করলো। অল্প সময়েই বাজার

খালি। এবার শুরু হলো বৃষ্টি। ক্রমে ক্রমে বাড়তেই থাকলো। থামার কোনও লক্ষণই দেখা গেল না। আমাদের মাথায় হাত। এতগুলো খাবার কে খাবে? এত টাকার জিনিসপত্র নষ্ট হবে? সকাল পর্যন্ত খাবারগুলো বাসি হয়ে যাবে। আর রাতের খাবার সকালে কেউ খেতে চাইবে না। সকালে সুদানীরা ভিন্ন খাবার খায়।

বাতাসের ঝাপটায় বাতিগুলো একে একে নিভে গেলো। বিদ্যুত তো সেই কবেই চলে গেছে। আমাদের দোকানে একটা বাতি মিটমিট করে কোনও রকমে জ্বলছিল। হা-হুতাশ করতে করতে দোকানে ঝাঁপ নামাতে উদ্যত হতেই দেখি, আমাদের বিপরীত পাশের দোকানের সামনে কী যেন একটা নড়ছে। দূর থেকে ঠাহর হলো না। চোর নয়তো! পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে চুরি করতে এসেছে? বৃষ্টি উপেক্ষা করে দৌড়ে রাস্তা পার হলাম। কাছে গিয়ে দেখি বোরখা গায় দেয়া এক মহিলা। কোলে একটা বাচ্চা।

-এখানে কী করছ?

-একটুখানি খাবারের খোঁজে বের হয়েছি!

-এই অবস্থায় তুমি খাবার কোথায় পাবে?

-বের না হয়ে উপায় ছিল না। বাচ্চার বাবা তিনদিন আগে মারা গিয়েছে। কাফন-দাফনের পর আর কিছুই বাকি ছিল না। এখানে আমরা ভাড়া বাসায় থাকি। সবাই ভেবেছে আমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে। কেউ কোন খোঁজখবর করেনি নতুন এসেছি এই এলাকায়। তিনদিন ধরে উপোস। আমার জন্যে কিছু না হলেও বাচ্চাটা যাতে দুধ পায় তার তো একটা ব্যবস্থা করা দরকার। তাই বাধ্য হয়ে আল্লাহর কাছে দুআ করে ঘর থেকে বের হয়েছি। তিনি যদি কোনও সাহায্য করেন!

আমি বেশ ভাবনায় পড়ে গেলাম। এই অসহায় মহিলাকে কিভাবে সাহায্য করা যায়? ভেবেচিন্তে বললাম,

-আসুন আমার সাথে।

মহিলাকে পেটপুরে খাইয়ে দিলাম। বাসার ঠিকানাটা রেখে দিলাম। একজন অসহায় বিধবা আর একটা এতিম শিশুর জন্যে কিছু করা যায় কি না ভেবে দেখব মহিলা ভীষণ কৃতজ্ঞচিত্তে দুআ করতে করতে বেরিয়ে গেল,

-আল্লাহ আপনার ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত দান করুন! আল্লাহ আপনাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মহিলা চলে যাওয়ার পর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। রাত গভীর হয়ে গেলো। বৃষ্টি কমারও কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এত রাতে খদ্দেরও আসার সম্ভাবনা নেই। এতগুলো খাবার নষ্ট হবে? আফসোস করতে করতে দোকান বন্ধ করতে শুরু করলাম। দোকানের শেষ ঝাঁপ নামানোর ঠিক আগমুহূর্তে অনেকটা নিঃশব্দে একটা বাস এসে দাঁড়াল। পর্যটন মন্ত্রণালয়ের লোগো সম্বলিত বাস। হুড়মুড় করে একদল ভিনদেশী পর্যটক বাস থেকে পিলপিল করে নেমে এল। সুদানী গাইড জানাল,

-আমরা বালুঝড়ে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। গাড়ির লোকেরা সেই দুপুর থেকেই অভুক্ত। কোথাও একটা খাবারের দোকান খোলা নেই। এই বৃষ্টিতে বাস চালিয়ে হোটেলে ফেরাও সম্ভব নয়। আপাতত তোমার রেস্তোরাঁয় খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে? বৃষ্টি বন্ধ হলেই চলে যাব। ততক্ষণ পর্যন্ত খেয়েদেয়ে বাসেই অপেক্ষা করব!

-অবশ্যই খাবারের ব্যবস্থা করা যাবে।

কয়েকজন কর্মচারী শুয়ে পড়েছিল। তাদেরকে জাগিয়ে দিলাম। এক এক করে সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হলো সকালের নাশতার জন্যে কিছু খাবার আগাম প্রস্তুত করে রাখা হয়েছিল। সেগুলোও রান্না করতে হলো। সবমিলিয়ে দোকানে কাঁচাপাকা আর কোনও খাবারই অবশিষ্ট রইল না। যাওয়ার সময় সবাই খাবারের ন্যায্য মূল্যের চেয়েও অনেক বেশি করে দাম তো চুকালই, উপরি বখশিশও দিয়ে গেলো আশাতীত। রান্না খুব ভাল লেগেছে। আগে খবর দিয়ে আবারও একদিন খেতে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেল। সুদানী গাইড আশ্বাস দিল, এবার থেকে সে নিয়মিত পর্যটনের বাসগুলোকে অন্তত একবেলার জন্যে হলেও এখানে এনে দাঁড় করাবে। তবে দোকানের সাজসজ্জা একটু উন্নত করতে হবে এই যা!

সবাই চলে যাওয়ার পর ভাবতে বসলাম, এই অপ্রত্যাশিত মুনাফার কারণ কী? বুঝতে পারছিলাম এটা সরাসরি আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা সাহায্য। চট করে মনে পড়লো সেই অসহায় মহিলার দু'আ! একজন সম্ভ্রান্ত আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মহিলার কৃতজ্ঞ গদগদ কণ্ঠস্বরের কথা! মনে আর কোনও সন্দেহ রইল না, আল্লাহ কেন এই অযাচিত সাহায্য পাঠালেন! মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে ফেললাম,

-একজন বিধবা ও একজন এতিমের সব দায়-দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেব। ইনশাআল্লাহ!

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৪

বাবা-মায়ের যত্ন

বিকেল বেলা। গোধূলিলগ্ন। বাড়ির বাগানে মা ও ছেলে বসে বসে কথা বলছেন। মায়ের বয়েস নব্বুই ছুঁইছুঁই। মা খুশি খুশি গলায় জড়ানো ভাষায় বলছেন,

-আমি তোর কাছে যতটা আদর-যত্নে আছি, অন্যদের কাছে এতটা থাকতাম না।

ছেলের কাছে মায়ের এভাবে বলাটা খারাপ লাগল। তড়িঘড়ি বলল,

-কী বলছেন আম্মু! আপনি কেন আমার কাছে থাকবেন? আমিই বরং আপনার কাছে আছি। আপনি আমার সাথে নয়, বরং আমিই আপনার সাথে থাকি।

-না বেটা! ছেলেবেলায় তুই আমাদের কাছে, আমাদের সাথে, আমাদের আশ্রয়ে থাকতি। বৃদ্ধ বয়েসে আমিই তোর কাছে আছি।

-আম্মু! এতে আপনাকে খাটো করা হয়ে যায় না?

-না বাবা, আল্লাহই তো এভাবে বলেছেন। তুই আয়াতটা পড়িসনি?

-কোনটা আম্মু?

-ঐ যে,

= পিতামাতার কোনও একজন অথবা উভয়ে যদি 'তোমার কাছে' বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে উফ্ পর্যন্ত বলো না। (সূরা বনী ইসরাঈল:২৩)

দেখ্ বেটা! এ-আয়াতে আল্লাহ তা'আলা নিজেই বলেছেন, 'তোমার কাছে' তাহলে তোর বলতে সমস্যা কোথায়?

তুই তো আদব শিখবি কুরআন থেকেই, নাকি তো কাছে যেটা সুন্দর মনে হয় সেটা?

-তাইতো! আম্মু মনে হচ্ছে আমি আয়াতটা আজ প্রথম শুনলাম!

জীবন জাগার গল্প: ৫৯৫

সিত্তুশ-শাম: যমররুদ খাতুন

একজন নারীর কি কি উপাধি থাকতে পারে? একজন নারীর কী কী গুণ থাকতে পারে? একজন পর্দানশীন নারী কী কী করতে পারে? একজন ধার্মিক নারী কী কী ভাবতে পারে? একজন মুসলিম নারীর কর্মক্ষমতা ও কার্যপরিধি কতটুকু হতে পারে?

✍✍✍

বাবা-মায়ের দেয়া নাম ছিল ফাতেমা খাতুন কিন্তু মানুষ চিনতো অনেকগুলো উপাধিতে। রাজকুমারী। গরীবের মা। জ্ঞানানুসন্ধানী। ইলমহিতৈষী। আলিমবান্ধব। রাজাদের বোন। শাসকদের ফুফু। রাজার স্ত্রী। আরো নানা জীবন্ত অভিধায় তাকে অভিহিত করা যায়। ছোট বড় মিলিয়ে তার আপন আত্মীয়দের মধ্যে প্রায় ৩৫জন রাজা ছিলেন। এতশত প্রাপ্তি তাকে অহংকারিণী করে তোলেনি। উল্টো তিনি ছিলেন বিনয়ী।

✍✍✍

বাবার নাম নাজমুদ্দীন রহ.। ভাইয়ের নাম সালাহুদ্দীন ইউসুফ রহ.। চাচার নাম আসাদুদ্দীন শেরকুহ রহ.। স্বামীর নাম নাসিরুদ্দীন। সম্পর্কে চাচাত ভাই। মানে শেরকুহের ছেলে। এতক্ষণে নিশ্চয় পরিষ্কার হয়ে গেছে, আমরা কার কথা বলছি!

✍✍✍

সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর মায়ের নাম সিত্তুল মুলক খাতুন। সন্তান লালন পালনে কত যত্নশীল, সেটা তার ছেলে সালাহুদ্দীন আইয়ুবীকে দেখলেই আন্দায করা যায়। ঠিক একইভাবে প্রতিপালন করেছেন মেয়েকেও।

✍✍✍

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী আপন বোনকে খুবই ভালবাসতেন। বোনও প্রতিটি বিষয়ে ভাইয়ের সাথে লেগে থাকতেন শেখার চেষ্টা করতেন। ক্ষেত্র বিশেষে ভাইকেও ছাড়িয়ে যেতেন। ভাইয়ের সাথেই ইলমুল ফিকহ, ইলমুল হাদীস অধ্যয়ন করেছেন। উভয়শাস্ত্রেই গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। মেয়েদের

মাদরাসায় তিনিই শিক্ষকতা করতেন। শাফেয়ী মাযহাবের ফিকহ্ শাস্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি ছিল বিস্ময়কর।

✍✍✍

নিজেই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বারানি মাদরাসা। পরবর্তীতে এটা হুসামি মাদরাসা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ৫৮২ হিজরীতে জুয়ানি মাদরাসাও প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত হননি, মাদরাসার যাবতীয় ব্যয়নির্বাহের জন্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তি থেকে বিপুল একটা অংশ মাদরাসার নামে ওয়াকফ করে দিয়েছেন।

✍✍✍

ভাইয়ের সাথে তার প্রতিযোগিতা নিয়মিতই চলছিল। দ্বীনি ইলমে ভাইয়ের সাথে পাল্লা দিয়েছেন। এবার শুরু করলে জাগতিক জ্ঞানে। সালাহুদ্দীন চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করেছিলেন। ওষুধ-পথ্য তৈরীতে পারদর্শী ছিলেন। এবার বোন এসে ভাইয়ের সাথে অবতীর্ণ হলেন। অল্প দিনের মধ্যে চিকিৎসা ও ঔষধিবিদ্যায় ভাইকে ছাড়িয়ে গেলেন।

✍✍✍

ওষুধ তৈরীর জন্যে একটা ল্যাব তৈরী করলেন। মুসলিম বিশ্বে তিনিই বোধ হয় প্রথম নারী, যিনি ল্যাব তৈরী করেছেন। ওষুধ কারখানায় একশ নারীকর্মী নিয়োগ দিলেন। এই নারীদের সবাই কুরআনের হাফেজ ছিল। অশ্বারোহণে দক্ষ ছিল। এ-দুই গুণ ছিল ল্যাবরেটরিতে চাকুরি করার মূল যোগ্যতা।

✍✍✍

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. বলতেন,

-আমি আমার বোন ছাড়া জীবনে আর কাউকে ঈর্ষা করিনি। সে চিকিৎসাবিদ্যা ও ঔষধিবিদ্যায় আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। আমি রাজকার্য নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ার কারণেই এমনটা ঘটেছে।

✍✍✍

তাকে প্রশ্ন করা হতো,

-আপনার কর্মীদের অশ্বারোহণে দক্ষ হতে হবে কেন?

-আমি তাদেরকে আল্লাহর রাস্তার লড়াকু হিশেবে দেখতে চাই! ঘোড়সওয়ার না হলে যুদ্ধে যাবে কী করে? ময়দানে তাদের কাজ হবে নার্সের। অসুস্থদের সেবা করবে।

-আর হাফেজ হতে হবে কেন?

-তারা পুরুষদের মধ্যে কাজ করবে, আল্লাহর কিতাব সীনায় থাকলে, ঈমান মজবুত থাকবে।

✍✍✍

এতকিছুর পরও তিনি ছিলেন একজন আদর্শ স্ত্রী। আদর্শ মাতা। শত ব্যস্ততা তাকে ঘরবিমুখ করেনি। স্বামী ছিলেন আপন চাচাত ভাই। তাদের সন্তানের নাম ছিল হুসামুদ্দীন। সালাহুদ্দীন ভাগ্নেকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন. ভাগ্নে সম্পর্কে বলতেন,

-আমি হুসামুদ্দীনের মতো আর কোনও শিশুকে এতটা আদর-যত্নে লালিত-পালিত হতে দেখিনি। আর কোনও মাকেও দেখিনি আমার বোনের মতো সন্তানকে গড়েপিটে বড় করতে!

✍✍✍

যুদ্ধের আগেই ভাইয়ের কাছে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জামের আবেদন করতেন!

-তোমার কি কি লাগবে?

-আপাতত একপাল উৎকৃষ্ট মানের ঘোড়া হলেই চলবে। আমাদের মেডিকেল টিমের জন্যে।

✍✍✍

হিত্তীনের যুদ্ধে ছেলে হুসামুদ্দীন শহীদ হলেন। খবরটা শুনে তিনি দামামা বাদকের কাছে খবর পাঠিয়েছিলেন, আরো জোরে বাজাও! এভাবেই কলিজার টুকরা পুত্রের শাহাদতকে উদযাপন করেছিলেন। অন্যদেরকেও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। সাধারণ শহীদদের মতো শহীদ ছেলেকে হিত্তীনের ময়দানেই দাফন করেছিলেন।

✍✍✍

তিনি ছিলেন ইবাদতগুজার। অবিশ্রান্ত কর্মযোদ্ধা। সিরিয়া অঞ্চলের বড় আলেমদের একজন। সামরিক কমান্ডার। স্বামীর জীবদ্দশাতেই ইন্তেকাল করেন। তার পরে স্বামী দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহণ করেননি। কেউ প্রশ্ন করলে বলতেন,

-সিত্তুশ শাম আমাকে যেভাবে ভালোবেসেছে, আর কোনও নারী সেভাবে ভালোবাসা দিতে পারবে বলে মনে করি না।

৫৫৫

স্ত্রীকেও ইতিপূর্বে প্রশ্ন করা হয়েছিল,

-আপনি কেন স্বামীকে এতবেশি ভালোবাসেন?

-আমি তার কাছে কোনও আবদার করার সাথে সাথেই সেটা সে পূরণ করতে উঠেপড়ে লেগে যেত। একবার একটা ঔষধিলতা পাচ্ছিলাম না, তাকে বলতেই সে বহুদূর থেকে খুঁজে এনেছিল।

৫৫৫

হাত খুলে দান করতেন। দানের ক্ষেত্রে কোনও বাছবিচার করতেন না। প্রাত্যহিক দান তো ছিলই, ঘটা করে বাৎসরিক দানও করতেন।

সুলতান নুরুদ্দীন যিনকী রহ. কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিমারিস্তানের দেখভালও তিনি কিছু কিছু করতেন।

৫৫৫

ছেলে হুসামুদ্দীন ছিলেন প্রথম স্বামীর সন্তান। চাচাত ভাই ছিলেন দ্বিতীয় স্বামী। প্রথম স্বামী মারা যাওয়ার পর তার সাথে বিয়ে হয়েছিল।

৫৫৫

সালাহুদ্দীন আইয়ুবী রহ. একজন খ্রিস্টান নাইটকে হত্যার করার কসম করেছিলেন। তার নাম ছিল আরনল্ড। কেউ কেউ বলে, আরনল্ড যেসব হজ্জ কাফেলায় আক্রমণ করে সম্পদ লুট করেছিল, তার একটাতে 'ফাতেমা খাতুনও' ছিলেন। ছেলের সাথে হজ্জে যাচ্ছিলেন।

৫৫৫

১৬-ই জিলকদ, ৬১৬ হিজরিতে এই অবিস্মরণীয় নারী ইন্তেকাল করেন। তার প্রতিষ্ঠিত হুসামি মাদরাসাতেই তাকে দাফন করা হয়েছিল দামেস্কে। বর্তমান সিরিয়ার রাজধানীতে।

৫৫৫

আমাদের ঘরে ঘরে এমন মহিয়সী কন্যা জন্ম নিক। নাজমুদ্দীনের মতো পিতা হয়ে যাক সমস্ত বাবা। প্রতিটি ভাই হয়ে যাক সালাহুদ্দীন।

জীবন জাগার গল্প: ৫৯৬

মুশরিক-মুসলিম: সেকাল-একাল

আল্লাহর কসম! তোমাকে কেউ একাকী ছেড়ে দিবে না!

-

কথাটা একজন মুশরিকের। একজন অবলা মুসলিম নারীকে উদ্দেশ্য করে বলা আজ চারদিকে নিজ ধর্মের হাজারো নারীকে চরমভাবে লাঞ্ছিত হতে দেখেও কারো মধ্যে কোনও বিকার নেই। অথচ আগেকার একজন মুশরিকও আজকের মুসলিম থেকে বেশি আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন ছিল।

✍✍✍

এটা সত্য, ঈমান হল বড় দৌলত। মুশরিক যতই ভালো কাজ করুক, একজন মুমিনের সমান কিছুতেই হতে পারবে না। কিন্তু একজন মুমিনকে তো সবদিক দিয়েই মুশরিকের চেয়ে ভালো হওয়া আবশ্যক!

✍✍✍

ঘটনাটা উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা রা.-এর। তখনো তিনি আবু সালামার স্ত্রী। কিছুদিন আগে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। হিজরত করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়েছেন। শিশুসন্তান সালামাকে কোলে নিয়েই উটের পিঠে চড়ে বসলেন। পথিমধ্যে মুগিরা গোত্রের লোকেরা বাধা দিয়ে উম্মে সালামা ও শিশু সালামাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। মুগিরা গোত্র ছিল উম্মে সালামার জ্ঞাতি। ঘটনা জানতে পেরে, আবু সালামার গোত্রের লোকেরা তার সাহায্যার্থে এগিয়ে এল। তারা বললো, আমাদের সন্তান অন্যের হাতে বন্দী থাকতে পারে না। শুরু হলো শিশু সালামাকে নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া। এক পর্যায়ে সালামার একটা হাত খুলে গেল।

✍✍✍

স্বামী সন্তান থেকে উম্মে সালামাকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হল। আবু সালামা বাধ্য হয়ে স্ত্রী-সন্তানকে রেখেই মদীনার পথে চলে গেলেন। কোনও রকমে প্রাণটা হাতে নিয়ে। পরে সুযোগ মতো এসে স্ত্রীকে উদ্ধার করবেন, এমনটাই হয়তো ভেবেছিলেন। সালামাকে উদ্ধার করে নিয়ে গিয়েছিল নিজ গোত্রের লোকেরা। উম্মে সালামাকে বন্দী করে রেখেছিল মুগিরা গোত্র।

✍✍✍

এদিকে সন্তান ও স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উম্মে সালামার দিন কাটছিল কেঁদে কেঁদে আর প্রতীক্ষার প্রহর গুণে। এভাবে প্রায় বছর খানেক সময় কেটে গেল পট পরিবর্তনের কোনও আশা দেখা গেল না। উম্মে সালামা প্রতিদিন স্বামীর অপেক্ষায় বস্তির অদূরে বসে বসে নীরবে চোখের পানি ফেলতেন।

✍✍✍

উম্মে সালামার এই করুণ দশা দেখে, এক লোকের মনে দয়ার উদ্রেক হলো। সে মুগিরার লোকদেরকে বলল,

-তোমরা এই বেচারীকে কেন আটকে রেখেছ? তার স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছ?

তখন মুগিরার লোকেরা উম্মে সালামাকে বলল,

-ঠিক আছে, তুমি এখন চাইলে তোমার স্বামীর কাছে ফিরে যেতে পারো!

শিশু সালামাকেও ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা হল। উম্মে সালামা রওয়ানা হলেন মদীনার পানে। একাকী। আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিল না সাথে। পথ চলতে চলতে 'তানঈম' নামক স্থানে পৌঁছলেন। সেখানে দেখা মিলল 'উসমান বিন তালহার'-এর সাথে।

-তুমি একাকী এই মরুপথ পাড়ি দিয়ে কোথায় চলেছ?

-মদীনায় আমার স্বামীর কাছে যাচ্ছি!

-তোমার সাথে কেউ নেই?

-আল্লাহ ছাড়া আমার সাথে আর কেউ নেই। তবে ছোট্ট শিশুটা আছে সাথে।

- আল্লাহর কসম! তোমাকে কেউ (এ অবস্থায়) একাকী ছেড়ে দিবে না!

উসমান বিন তালহা এগিয়ে এসে উটের লাগাম তুলে নিল। উম্মে সালামা পরবর্তীতে বলেছেন,

-আমি উসমান বিন তালহার মতো মহৎ মানুষ আরবে খুব কমই দেখেছি! এক মনযিল অতিক্রম করার পর, সে উটকে বসাতো। তারপর আমাকে নামার সুযোগ করে দিয়ে পিছিয়ে যেত। তারপর এগিয়ে এসে উটকে একটা গাছের সাথে বাঁধতো। তারপর প্রয়োজন শেষ হলে, সে এসে উটকে আবার বসাত। তারপর দূরে সরে গিয়ে বলত, উঠে বসো। এভাবে সে আমাকে

মদীনার অদূরে কুবা পল্লীতে অবস্থান করা আমার স্বামীর কাছে নিয়ে এসেছিল। আমার পরিবারের মত এমন বিপর্যয় আরবের খুব কম পরিবারের ওপরই এসেছে আর উসমান বিন তালহার মতো মহৎ মনুষ্যও খুব কমই দেখেছি।

উসমান বিন তালহা পরবর্তীতে ইসলাম গ্রহণ করলেও, উম্মে সালামাকে সাহায্য করার সময় তিনি মুশরিক ছিলেন। একজন মুশরিক হয়েও একজন মুমিন নারীর বিপদে জান নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। আজ সিরিয়ায়, ইরাকে, কাশ্মীরে, ফিলিস্তীনে নিজ ধর্মের নারীদের চরম বিপর্যয়েও বড় বড় 'শায়খ', মহান মহান মুসলিম নেতার কোনও ভাবান্তর হচ্ছে না!

জীবন জাগার গল্প: ৫২৭

নেক সন্তান

-শায়খ!

-জি! বলো?

-আমি কি সালেহ (সৎ) নাকি তালেহ (অসৎ) কিভাবে বুঝব?

-সেটা বোঝা তো একদম সহজ।

-কিভাবে?

-এসো, তোমাকে শুধু একটা প্রশ্ন করবো, তুমি হ্যাঁ বা না দিয়ে উত্তর দিবে?

-তুমি আজ তোমার বাবা-মায়ের জন্যে দু'আ করেছ?

-না তো!

-তাহলে তুমি অসৎ।

-তা কী করে হয়? আমি তো নামাজ পড়ি, রোজা রাখি, শরীয়তের সবকিছু মেনে চলার চেষ্টা করি।

-তা হোক। তুমি যাই মানো। হাদীসের বিচারে তুমি এখনো সৎ হতে পারোনি।

-কোন হাদীস?

-ঐ যে একটা হাদীস আছে না!

=মানুষ যখন মারা যায়, তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। শুধু বাকী থাকে তিনটা আমল।

এক: সদকায়ে জারিয়া।

দুই: উপকারী ইলম।

তিন: নেক সন্তান যে তার জন্যে দু'আ করে।

তুমি তিন নাম্বারটা লক্ষ্য করেছ, নেক সন্তান সেই যে, বাবা-মায়ের জন্যে দু'আ করে।

জীবন জাগার গল্প: ৫৭৮

স্বৈরাচার

চীনা দার্শনিক কনফুশিয়াস। একদিন শাগরিদদের নিয়ে ঘুরতে বের হলেন। এটাও ছিল কনফুশিয়সের শিক্ষাদানের অন্যতম একটা পদ্ধতি। যেতে যেতে এক পাহাড়ের পাদদেশে দেখলেন, এক মহিলা বসে বসে কাঁদছে। পাশেই সদ্য খোঁড়া কবর।

-তুমি কেন কাঁদছ?

-একটা হিংস্র বাঘ আমার শ্বশুরকে মুখে করে নিয়ে গেছে। কয়দিন পর আমার স্বামীরও একই পরিণতি হয়েছে। তাও ছেলেটা ছিল শেষ আশা-ভরসা। অন্ধের যষ্ঠি! গতকাল বাঘটা এসে আমার কলিজার টুকরাটাকেও নিয়ে গেছে। তার হাড়গুলো জমা করে এখানে কবর দিয়েছি!

-একের পর এক বিপদ আসছে, তবুও তোমরা এ-জায়গা ছেড়ে চলে যাওনি কেন?

-এই দেশটা আমাদের কাছে বড় ভালো লেগে গিয়েছিল!

-কেন?

-কারণ এখানে কোনও স্বৈরশাসক নেই।

কনফুশিয়াস এবার শিষ্যদের দিকে ফিরে বললেন,

-দেখলে তো! মুখস্থ করে রাখার মত কথা। স্বৈরাচারী সরকার বনের হিংস্র পশুর চেয়েও বিপজ্জনক!

জীবন জাগার গল্প: ৫৯৯

কিছু প্রশ্ন

-হুযুর! আমি কি কয়েকটা প্রশ্ন করতে পারি?

-অবশ্যই পার, আমি তো তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্যেই প্রতিদিন এশার পর মসজিদে বসে থাকি।

-আমি একজন উপযুক্ত বউ চাই, আমাকে এখন কী করতে হবে?

-উত্তর সহজ, তোমাকে আগে উপযুক্ত স্বামী হতে হবে।

✍

-খেতে বসলে আমার হুঁশজ্ঞান থাকে না। আমার কতটুকু খাওয়া উচিত?
-ক্ষুধার চেয়ে বেশি, পরিতৃপ্তির চেয়ে কম খাবে।

✍

-আমি হাসি থামাতে পারি না। কতটুকু হাসব?
-আওয়াজ উঁচু না করে, চেহারার পরিবর্তন না ঘটিয়ে যতটুকু পারো হাসবে।

✍

-তাহলে কাঁদব কতটুকু?
-আল্লাহর ভয়ে পারলে সারাক্ষণই কাঁদবে।

✍

-কোন ভাল কাজ করলেই, সেটা কাউকে না বলা পর্যন্ত একদণ্ড শান্তি পাই না। ভাল কাজ কতটা গোপন রাখব?
-তুমি যতটা সম্ভব হয় গোপন রাখবে। বেশি জোরাজুরি করে গোপন রাখার প্রয়োজন নেই।

✍

-তাহলে প্রকাশ করতে বাধা নেই বলছেন?

-জি

-কতটুকু প্রকাশ করব, পরিমাণটুকু বলে দিলে সহজ হত!

-যতটুকু প্রকাশ করলে, অন্যরাও তোমার আমলটা করতে উদ্বুদ্ধ হবে ততটুকু।

✍

-বন্ধু-বান্ধবরা অনেক সময় প্রশংসা করে। প্রশংসা শুনতে কার না ভাল লাগে বলুন? আমি প্রশংসায় কতটুকু আনন্দিত হব?
-আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট না অসন্তুষ্ট সেটার হিশেব কষে, পরিমাণ মত আনন্দিত হবে।

✍

-মানুষ নিন্দা করলে মনটা একদম ভেঙে পড়তে চায়। এটা একদম সহ্য হয় না। অন্যের নিন্দা-সমালোচনায় আমার আসলে কতটা পেরেশান হওয়া উচিত?
-তুমি যদি আল্লাহর কাছে প্রশংসিত হও, তাহলে পুরো দুনিয়ার কাছে নিন্দিত হলেই বা তোমার কী আসে যায়?

জীবন জাগার গল্প : ৬০০

ঈমান!

স্ত্রী: কী ব্যাপার! তুমি ওমরায় এসে খাওয়া-দাওয়া বাড়িয়ে দিয়েছ! যে মানুষ জীবনে কলা ছুঁয়েও দেখ না, এখানে এসে বাছবিচার ছাড়া খাচ্ছ? ডাক্তার তোমাকে কলা খেতে বারণ করেননি?
স্বামী: এখানের ফলমূলে কোন ক্ষতিকর কিছু নেই। থাকতে পারে না।
-কেন এখানকার কলা তো দেশের কলার মতই?
-একই। তবে এখানের কলায় বাড়তি একটা বিষয় আছে!
-কী সেই বাড়তি বিষয়?
-দু'আর প্রভাব!
-কলার মধ্যে কার দু'আর প্রভাব আবিষ্কার করলে?
-জাতির পিতার!
-ও আল্লাহ! 'উনি' আরবের কলা নিয়েও স্বপ্ন দেখে গেছেন? কোথায় পেলে এই তথ্য?
-কুরআনে আছে!
-ওরে আমার মাথা ঘুরছে! ওনার নাম কুরআনেও আছে? কুরআন

নাজিল হওয়ার কত্তো পরে উনি জন্মগ্রহণ করেছেন?

-কী বলছ তুমি! উনি কুরআন নাযিলের ২৫শ বছর আগে জন্ম নিয়েছেন।

-ওহ্ হো! তুমি ইবরাহীম আ.-এর কথা বলছো!

-জি ম্যাডাম! তিনি আমার কলার জন্যে দু'আ করে গেছেন। তিনি বলেছেন,

=ইয়া রব! তাদেরকে ফল-ফলাদি দ্বারা রিযিক দান করুন। (ইবরাহীম:৩৭) বাবার দু'আ থাকলে, আর ভয় কি? তুমি কী বলো? আর বাবা কি ক্ষতিকর কিছুর দু'আ করতে পারেন?

-না পারেন না। শুধু খেলেই হবে, আর কিছু করতে হবে না?

-কী করব?

-ওরে পেটুক রে! খাওয়ার কথাটাই মনে রাখলে, সেই আয়াতের শেষে শুকরিয়া আদায়ের কথা বলা হয়েছে না?

-ইশশিরে! আল হামদুলিল্লাহ!

জীবন জাগার গল্প : ৬০১

কুরআন নিয়ে

আমি আর মুনযির গেলাম কাঁটাবন। দুজনে একটা দোকানে বই পড়ছি, বই দেখছি, কথা বলছি, মত বিনিময় করছি। একজন মহিলা এলেন। তিনি কিছু ইসলামি বই কিনলেন। তার মধ্যে বাংলা কুরআন তরজমাও কিনলেন একটা।

মহিলার পাশে আরেকজন লোক দাঁড়িয়ে বই নাড়াচাড়া করছিলেন। আমরা ভেবেছিলাম তারা দুজন একসাথে এসেছেন। পরক্ষণেই ভুল ভাঙল। লোকটা বলে উঠল,

-আপনি কুরআন তরজমা এটা না কিনে 'ওটা' কিনতে পারেন।

লোকটা একটা নির্দিষ্ট তরজমার নাম বলল। সেই তরজমাটা আমার কাছে আছে। আমার জানা ছিল 'ওটা' কুরআন কারীমের সরাসরি তরজমা নয়, মর্মবাণী। লেখক কুরআন কারীমের আয়াতগুলোর একটা সারাংশ লেখার চেষ্টা করেছেন।

একে তো আরবি ছাড়া শুধু বাংলা বা অন্য কোনও ভাষায় শুধু তরজমা প্রকাশ করাকে উলামায়ে কেরাম নাজায়েয বলেন। তার ওপর আবার সারাংশ প্রকাশ তো মোটেও প্রশংসনীয় হতে পারে না।

ইদানীং একটা প্রবণতা শুরু হয়েছে, কুরআন শরীরের তরজমা দেখে তরজমা লেখা। মুল আরবি না বুঝেই কুরআন তরজমা লিখে ছাপিয়ে ফেলা। অথবা কিছু কিছু আরবি শিখেই কুরআন গবেষক বনে যাওয়া।

কুরআন সবাই পড়বে, সবাই বোঝার চেষ্টা করবে, সেটা দোষের কিছু নয়। কুরআনে বাণী প্রচারও করবে সেটাও ঠিক আছে। কিন্তু কুরআন কারীমকে এভাবে বাজারি বইয়ের মতো করে ফেললে তো সমস্যা।

লোকটা এরপর লম্বা একটা বক্তব্য দিল। মহিলাটা তো বটেই আমরা এবং দোকানদার পর্যন্ত বিরক্তিবোধ করতে লাগল। লোকটার বক্তব্যের সারাংশ এই,

-আপনি এই বইটা পড়লেই কুরআন শরীফের পুরো নির্যাসটুকু পেয়ে যাবেন। অন্য কোনও তরজমা পড়তে হবে না।

মহিলাটা বলল,

-আমি তো সরাসরি কুরআন কারীম থেকে বুঝতে চাই। আমি তো সারাংশ পড়তে চাচ্ছি না। মূল 'টেক্সট' পড়ে তরজামা বুঝতে চাচ্ছি।

-সরাসরি কুরআন পড়ে তার অর্থ বোঝার ক্ষমতা আপনার-আমার মতো মানুষের নেই।

মহিলা এতক্ষণ চুপচাপ লোকটার বক্তব্য শুনে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন,

-আপনার বইটার লেখক কি সরাসরি আরবি থেকেই মর্মবাণীটা লিখেছেন?

-না, তিনি ইংরেজি-বাঙলা বিভিন্ন তরজমা-তাফসীর দেখে লিখেছেন।

-উনি শুধু বাংলা-ইংরেজি জেনেই কুরআনের মর্মবাণী লেখার সাহস করে ফেললেন? আমি তো আরবি নিয়ে পড়াশুনা করছি বেশ কয়েক বছর ধরে, আমিও কুরআন কারীম নিয়ে মোটামুটি পড়াশুনা করার চেষ্টা করি। কই আমার তো এখনো কুরআন তরজমা কিংবা তাফসীর অথবা মর্মবাণী লেখার সাহস হলো না?

মহিলাটার কথা শুনে আমি আর মুনযির তো রীতিমত মুগ্ধ। লোকটাকে এভাবে বোল্ড করে দিল? লোকটা কাঁচুমাচু ভঙ্গি দেখে মুনযির বলল,

-জোঁকের মুখে লবণ পড়েছে।

জীবন জাগার গল্প : ৬০২

প্রকৃত ভালোবাসা

আম্মু যখন আদর করে ছোট্ট শিশুকে চুমু খেতে খেতে বলেন,
-বাছা আমার লাখে একটা।
= এটাই ভালোবাসা।

✍✍✍
ছেলে অফিস থেকে ফিরতে বিলম্ব হলে ঘর-বাহির করা বাবা যখন বলেন,
-খোকা আজ এত দেরী হল যে!
= এটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍
বড় আপু শ্বশুর বাড়ির শত ব্যস্ততার মাঝেও যখন এসে হাসিমুখে বলেন, তোর জন্যে একটা টুকটুকে বউ দেখেছি। তোর পছন্দ-অপছন্দ জানাস।
= এটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍
বাবার অবর্তমানে বড় ভাইয়া যখন বলেন,
-তোকে টাকা পয়সার চিন্তা করতে কে বলেছে? তুই মন দিয়ে লেখাপড়া করে যা।
= এটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍
মন খারাপ করে ঘরে বসে থাকতে দেখলে ছোট বোন যখন বলে,
-চলো ভাইয়া, কোথাও ঘুরে আসি।
= এটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍
কয়েকদিন বিরতির পর আপন বন্ধু যখন বলে,
-দোস্ত! তুই না থাকলে সময়টাই পানসে হয়ে যায় রে!
= এটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍

ছেলেবন্ধু বা মেয়েবন্ধু বানানো, তাদের নিয়ে উদ্দাম ঘুরে বেড়ানো কখনোই প্রকৃত ভালোবাসা নয়। ভালোবাসা হলো, নিজের কাছের মানুষ, পরিবারের মানুষগুলোকে সময় দেয়া।

✍✍✍

মাথা ব্যথা হলে ছোট্ট খুকি যখন তার আদুরে হাতটা বাবার মাথায় আলতো করে বুলিয়ে দেয়।

= সেটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍

স্বামীর জন্য চা বানিয়ে স্ত্রী যখন আগে নিজে এক চুমুক দিয়ে দেখে চিনি ঠিক আছে কিনা।

= সেটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍

আম্মু যখন নিজে না খেয়ে কেকের বড় টুকরাটা ছেলেকে দিয়ে দেন।

=সেটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍

পিচ্ছিল রাস্তায় বন্ধু যখন শক্ত করে হাত ধরে পথ চলতে সাহায্য করে।

= সেটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍

হোস্টেলে ফেরার পর ভাইয়া যখন মেসেজ পাঠিয়ে জানতে চায়,

-ছোটন, ঠিকমতো পৌঁছতে পেরেছিস?

= সেটাই প্রকৃত ভালোবাসা।

✍✍✍

স্ত্রীকে হাসানোর জন্যে ছোট্ট একটা কৌতুক লিখে মেসেজ পাঠানোও ভালোবাসা। আসলে ভালোবাসা মানে,

= কাছের মানুষগুলোর প্রতি বাড়তি খেয়াল। তাদের আদর-যত্ন নেয়া।

জীবন জাগার গল্প : ৬০৩

ধনী আম্মু

স্কুলের টিফিনে দুই সহপাঠী ঝগড়া বেঁধেছে। একজন ধনী, আরেকজন গরীব। দুইজনেরই অনড় দাবি।

-আমার আম্মুই বেশি ধনী!

গরীব মেয়েঃ কিভাবে বলো দেখি!

বড়লোক মেয়েঃ আম্মু আমার জন্যে নতুন গাড়ি কিনেছে। স্কুলে আসার সুবিধার্থে। একজন সার্বক্ষণিক আয়া রেখেছে। আম্মু চাকুরিতে বের হলে আয়া খালাই আমাকে আদর-যত্ন করে রাখে। অসুস্থ হলে একজন নার্স রাতদিন আমার সেবা করে! প্রতিটি বিষয়ের জন্যেই, একজন করে 'টিউটর' ঠিক করে দিয়েছেন। তারা প্রায় সব পড়াই আমাকে হাতে-কলমে শিখিয়ে-পড়িয়ে দেয়। খাওয়া-দাওয়ায় যাতে কোনও ঘাটতি না হয়, সেজন্য একজন অভিজ্ঞ বাবুর্চিও রেখে দিয়েছেন। তোমার তো এসবের কিছুই নেই। এবার বলো, কার মা বেশি ধনী?

গরীব মেয়েঃ তবুও আমি বলবো, আমার আম্মুই বেশি ধনী।

-কিভাবে?

-আম্মু নিজেই আমার জন্যে খাবার রান্না করেন। এমন সুস্বাদু খাবার পৃথিবীর কেউ রান্না করতে পারবে বলে মনে হয় না।

আম্মু নিজেই আমার পড়া দেখিয়ে দেন। অসুস্থ হলে নিজেই রাত জেগে সেবা-যত্ন করেন। আমি খেয়ে বাঁচলে সেটাই খান। জোর করেও কোনদিন আমার আগে তাকে খাওয়াতে পারিনি। অনেক সময় আমাকে পেটপুরে খাইয়ে তিনি অভুক্তও থাকেন। তিনি আমাকে সদ্য রান্না করা খাবার খাইয়ে নিজে বাসি খাবারটাই খেয়ে নেন। অসুস্থ হলে, যেভাবেই হোক ওষুধ নিয়ে আসেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হলে ওষুধ কেনার টাকা যোগাড় হয় না। আমার জন্যে প্রতিবছরই নতুন জামা কেনেন। কিন্তু নিজে সেই পুরনো ছেঁড়া বিয়ের শাড়িতেই দিন গুজরান করেন। আমার পুরনো জামা দিয়ে তালি লাগান।

আম্মু চাইলে চাকুরিও করতে পারতেন। তার সে শিক্ষাগত যোগ্যতাও ছিল। কিন্তু আমাকে পুরো সময় দেয়ার জন্যে ও-পথে পা বাড়াননি। তার মধ্যে যে ভালোবাসার সম্পদ আছে সেটার সাথে কোনও গাড়ি-ঘোড়ার তুলনা চলে?

জীবন জাগার গল্প : ৬০৪

কিছু উপলব্ধি

এক : ভালোবাসার কারণে অনেক চোখেই আনন্দের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হয়। কিন্তু ভালোবাসা ফেরত পাওয়ার পর সেই একই চোখই অশ্রুতে ভরে যায়।

✍

দুই : আমি আমার অতীতকে বদলাতে পারবো না। কিন্তু বর্তমান আর ভবিষ্যতকে আরো ভালো তে রূপান্তরিত করতে পারি।

তিন : নির্ঘুম রাতজাগাটা খুবই মজার যখন সেটা আমি নিজে বেছে নেই। কিন্তু এই বিনিদ্রা নিজেই যখন আমাকে বেছে নেয় তখন সেটা হয়ে যায় ভয়াবহ।

✍

চার : এমনকি পাখিরাও যখন বিষণ্ণ হয়, তাদের আওয়াজ বড় করুণ হয়ে যায়।

✍

পাঁচ : আমি যখন উপরে উঠবো তখন বন্ধুরা আমাকে চিনতে পারে। আর আমি যখন পড়ে যাব, তখন আমি বন্ধুদেরকে চিনতে পারবো ।

✍

ছয় : দুটি বিপরীত বস্তুর ফলাফল এক। অতি সুখ ও অতি দুঃখ। এই দুই অবস্থাতেই আমি ঘুমুতে পারি না।

✍

সাত : যে চলেই যাবে, তাকে চলে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করে আটকানোর চেষ্টা করা বৃথা। কারণ সে ব্যাগ গোছানোর আগেই 'অজুহাত' গুছিয়ে রেখেছে।

✍

আট : জীবন আমাকে শিক্ষা দিয়েছে, যা কিছু আমি ভালবাসি সারাক্ষণ সেগুলো হারানোর আশংকায় ব্যাকুল থাকি।

✍
নয় : যখন পুরোপুরি জানা হয়ে যায়, আমার কথা-ব্যথা-অনুভূতি সে বুঝতে পারবে না তখন চুপ থাকাই শ্রেষ্ঠ কৌশল।

✍
দশ : যারা হৃদয়ে পুষে রাখা কষ্ট খুলে বলতে পারে না, তারাই দ্রুত কেঁদে ফেলে।

✍
এগার : সবচেয়ে অবাক করা অনুভূতি হলোঃ আমি আমার পুরনো আমিকে কল্পনা করতে ভয় পাই।

✍
বার : চট করে কেউ এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় যেতে পারে না। তবে এটুকু হতে পারে যে, আমরা যখন আমাদের চামড়ার চোখ বন্ধ করে ভাবনার চোখ খুলে দিই, তখন এমন কিছু সত্য আবিস্কৃত হয়, যা আমরা চর্মচোখ ও মনচোখ উভয়টা দিয়েও দেখতে পাইনি।

জীবন জাগার গল্প : ৬০৫

যামাকিতালঃ কুরআনি মাহির!

ব্রুস লি নামটা সারা বিশ্বে পরিচিত। মার্শাল আর্টের একজন পথিকৃত বলা যায় তাকে। বাস্তবে যাই হোক, প্রচারমাধ্যমের বদৌলতে একটা কথা বেশ রটে গিয়েছিল বিশ্বে মানুষ থাকলে এই একজনই আছে। অপরাজেয়। দুর্ধর্ষ ব্রুস লি।

ছাত্রকালে গুরুজির কাছে টুকটাক যা কিছু শিখেছি, সঠিক ইতিহাস না জানার কারণে চোখের সামনে সবসময় একটা ছবিই ভাসতো। ব্রুস লি। তার মত হতে হবে। সবকিছু ভেঙে তছনছ করে দিতে হবে। ঘুষি মেরে একসাথে দশজনকে ফ্ল্যাট করে দিতে হবে লাথির চোটে দমকা হাওয়া বইয়ে দিতে হবে। অবশ্য আমাদের কোটেই কিছু বড় ভাই ছিলেন অতুলনীয় যোগ্যতার অধিকারী।

✍✍✍

বিশ্বে মারামারি চিত্র কল্পনা করলে, শুধু মোহাম্মাদ আলীর কথা মনে পড়ত। মনে মনে ভাবতাম, একবার যদি ব্রুস লিকে আলীর সামনে আনা যেত তাহলেই হত। এক ঘুষিতেই চীনাম্যানের দফারফা হয়ে যেতো। বড় হয়ে বুঝতে পারলাম আলী যে ঘরানার ফাইটার সেটা দিয়ে ব্রুস লির মুখোমুখি হওয়া সম্ভব নয়। আমাদের ওস্তাদের আখড়াতেই একটা ঘটনা ঘটেছিল। ঢাকা থেকে একজন বক্সিং শিখে এল পটিয়াতে। সে কি হম্বিতম্বি! একে মেরে ফেলবে! ওকে শুইয়ে দিবে! বড় ওস্তাদ আবুল কালাম তার এক অভিজ্ঞ ছাত্রকে বললেন,

-এই ব্যাটাকে একটু শান্টিং দিয়ে দে তো!

লড়াই শুরু হলো। বক্সার মশায় প্রথম প্রথম বেশ লাফালাফি করলো। একটু পরে, মোক্ষম এক 'গিরি' (লাথি) খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এমন কাৎরাতে লাগলো যে দেখে মায়াই লাগলো। মনে একটা খেদ থেকে গিয়েছিল, ব্রুস লিকে বুঝি হারানোর মতো কেউ নেই? এতদিন জানতে পারলাম 'আছে'। বরং বলা ভালো 'ছিল'।

✍✍✍

মানুষটার পরিচয় জানতে হলে যেতে হবে 'তিউনিশিয়াতে'। শায়খ মুনসিফ উরগী (রহ.)। একজন মুসলিম খালিহাতে আত্মরক্ষাবিদ। বড়ই স্বাধীনচেতা মানুষ। ষোল বছর জেল খেটেছেন। তবুও স্বৈরাচারের সাথে আপস করেননি। তিউনিসিয়ার ক্ষমতাচ্যুত শাসক যায়নুল আবেদিন বেন আলির খাহেশ হলো, শায়খ উরগীর যোগ্যতাকে নিজের অনুকূলে কাজে লাগাবে। সেমতে প্রস্তাব দেয়া হলো,

-সেনাবাহিনীর বিশেষ স্কোয়াডকে কমান্ডো ট্রেনিং দিতে হবে। এরা প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তার দিকটা দেখবে।

শায়খ রাষ্ট্রীয় প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করলেন। নানাভাবে ভয় দেখানো হলো। গুম-খুনের হুমকি-ধমকি দেয়া হলো। কিছুতেই টলানো গেলো না। সরকার এ কৌশলে ব্যর্থ হয়ে, বাঁকা পথে গেল। শায়খ উরগিকে গ্রেফতার করা হল। বলে দেয়া হল,

-প্রস্তাবে যতদিন রাজি হবে না ততদিন কারাগারে পঁচতে হবে। শায়খ উরগী মোটেও পাত্তা দিলেন না। একটানা ষোল বছর জেলে কাটিয়ে দিলেন। বাইরে তার বউ-বাচ্চা অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটিয়েছিল, তা সত্ত্বেও আদর্শচ্যুত হননি।

✍✍✍

মাত্র ১৪ বছর বয়েসেই মুজাহিদ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। আলজেরিয়াতে। ১৯৫৬ সালে। ফরাসীদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে তার দুঃসাহসিক ভূমিকা সবার ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছিল। কিন্তু শায়খ উরগী এসব প্রশংসার উর্ধ্বে। তার কাছে 'কিতাল-জিহাদ'ই ছিল ধ্যানজ্ঞানজপ। সারাক্ষণই কিছু না কিছু শেখার চেষ্টা করতেন। ছেলেবেলাতেই কুরআন কারীম হেফজ করেছিলেন। বাবার কাছে শরীরচর্চার প্রথম পাঠ নিয়েছিলেন। একসাথে তিন দেশের সামরিক প্রশিক্ষণ নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। জার্মানি নাজী বাহিনী, ফরাসী বাহিনী ও আলজেরিয়ান মুজাহিদ বাহিনী।

✍✍✍

৮ বছর কাটিয়েছিলেন মুজাহিদ বাহিনীর সাথে। তার সহযোদ্ধাদের মধ্যে আলজেরিয়ার প্রয়াত প্রেসিডেন্ট হুয়ারি বুমেদিনও ছিল। ১৯৪২ সালের দিকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তার বাবা তিন বছর জার্মানিতে নাজী বাহিনীতে কাজ করেছিলেন। শিশুবেলাতেই বাবার সাথে একটানা ৭ বছর পায়ে হেঁটে চষে বেড়িয়েছেন তিউনিশিয়া-আলজেরিয়া-মরক্কোর পথ-প্রান্তর। ফরাসি উপনিবেশের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলার কাজে। ছেলেবেলার পদব্রজে এই দীর্ঘ পথচলা শায়খ উরগীকে অনেক কিছু শিখিয়েছিল। যেখানেই গিয়েছেন, সেখানকার স্থানীয় আত্মরক্ষা বিদ্যা শেখার প্রতি সচেষ্ট হয়েছেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পর তিনি পায়ে হেঁটে বিশ্বভ্রমণে বের হয়ে পড়েন। প্রায় একলক্ষ তিশ হাজার কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পাড়ি দিয়েছেন। ৩০টারও বেশি দেশে গিয়েছেন। এই দীর্ঘ পথপরিক্রমার উদ্দেশ্য একটাই, আত্মরক্ষা পদ্ধতি শেখা। যেখানেই এই শিল্পের ছিঁটেফোঁটা কিছু অবশিষ্ট আছে বলে তার কানে এসেছে, সেখানেই ছুটে গিয়েছেন। ভারত, পাকিস্তান, চীন, জাপান, কোরিয়া, বার্মা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, মালয়শিয়া, ইন্দোনেশিয়াসহ বহুদেশে।

✍✍✍

বিশ্বের বড় বড় ওস্তাদদের কাছ থেকে 'বেল্ট' পেয়েছেন। একটানা ষাট বছর তিনি এই বিদ্যা অর্জন করেছেন। আলজেরিয়ার স্বাধীনতার পর ১৯৬৬ সালের দিকে তিউনিশিয়ায় ফিরে এসেছিলেন। বিমান বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু ধরাবাঁধা জীবন তার ভালো লাগলো না। একদিন চুপিচুপি

জার্মানি চলে গেলেন। সেখানে গিয়ে অনেক নতুন আত্মরক্ষা পদ্ধতি শিখলেন। জার্মানরাও তাকে লুফে নিল ১৯৭৩ সালে আবার তিউনিশিয়ায় ফিরে এলেন। কিন্তু মন টিকল না। এবার চলে গেলেন জাপান। পায়ে হেঁটে। পথে পথে পেলেন যুগোশ্লাভিয়া, আলবেনিয়া, তুরস্কসহ বহু দেশ। প্রতিটি দেশের নিজস্ব আত্মরক্ষা কৌশল শিখে নিলেন।

✍✍✍

১৯৮২ সালে শেষবারের মতো তিউনিশিয়ায় ফিরে আসেন। ১৯৯২ সালে বন্দী হয়েছিলেন। ২০১১ সালে আরব বসন্তের পর মুক্তি পান। জেলখানায় বসে সময়টা নষ্ট করেননি। তার সারাজীবনের সঞ্চিত জ্ঞানকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দান করার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

✍✍✍

একটা সাক্ষাতকারে তার জীবনের মোটামুটি অনেকটাই উঠে এসেছে।

-আপনার প্রায় পুরো জীবনই কেটেছে পায়ে হেঁটে। কারণ কী?

-কুরআন কারীমের বাণী অনুসরণ করেই এটা করেছি। সুরা মুলকে আছে, তোমরা পৃথিবীর দিক-দিগন্তে হেঁটে দেখো।

আরেক জায়গায় আছে, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো।

-গাড়িতে চড়ে গেলে সময় বাঁচতো না?

-কিসের সময়? আমি তো মানুষের কাছ থেকে শিখতেই ভ্রমণে বের হয়েছি। আল্লাহর যমীন দেখার জন্যে বের হয়েছি। দ্রুত চলে গেলে কি দেখা হত? বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে এতকিছু শেখা হত? জানা হত কোথায় আমার কাঙ্খিত বস্তু আছে?

-আপনার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু বলুন!

-বলার মত তেমন কিছু নেই। আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল ভারতে। বোম্বাই গিয়েছিলাম শেখার উদ্দেশ্যে সেখানে 'জীনাত আহমাদ' নামে এক মুসলিম অভিনেত্রীর সাথে পরিচয় হয়। সম্পর্কটা বিয়ে পর্যন্ত গড়ায়। সবকিছু ঠিকঠাক! বিয়ের তারিখের আসার ঠিক আগমুহূর্তে সংবাদ পেলাম, শিখদের প্রধান ধর্মালয় গুরুদুয়ারায় এক বিশেষ পদ্ধতির আত্মরক্ষা পদ্ধতির চর্চা হয়। ব্যাস অমনি সেখানে ছুট দিলাম। বিয়ের কথা মনেও রইল না।

-তাহলে বিয়ে কখন হল?

-সেটা আরও পরে, মালয়শিয়াতে। সেখানকার এক গুরুর কাছে শিখতে গিয়েছি। সেখানেই একজনকে ভাল লেগে গেল। সেও ছিল একজন দক্ষ যোদ্ধা।

-আপনার যামাকিতাল সম্পর্কে বলুন।

-যামাকিতাল হলো বিশ্বের সবচেয়ে নিখুঁত ও সমৃদ্ধ আত্মরক্ষা পদ্ধতি! বিশ্বের এমন কোনও কৌশল নেই, যেটা আমি অর্জন করার চেষ্টা করিনি। এশিয়া-ইউরোপ-আফ্রিকার সমস্ত ওস্তাদের কাছে আমি আত্মরক্ষার পাঠ নিয়েছি। সেসবকে একত্র করে আমি আমাদের 'যামাকিতাল' দাঁড় করিয়েছি।

-এর বৈশিষ্ট্য কি?

-এটা সম্পূর্ণ ইসলামি 'মার্শাল আর্ট'। বিশ্বের অন্য স্থানের আত্মরক্ষা পদ্ধতিগুলোতে চায়না বা জাপানী পরিভাষা চলে। আমাদের পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ আরবী পরিভাষা। এবং কৌশলগুলো বের করা হয়েছে কুরআনের আয়াতকে সামনে রেখে। আমাদের একটা সঙ্গীত আছে। সেটা শুনলে যোদ্ধারা খাঁটি ইসলামী জিহাদে উদ্বুদ্ধ হয়। লড়াইয়ের শুরুতে বিসমিল্লাহ পড়তে হয়। দোয়া-দুরূদ পড়তে হয়।

-নামের রহস্যটা কী?

-(ক) যাঃ যামান বা সময়। সময় হলো দোধারী তলোয়ারের মতো। আমি না কাটলে, আমাকেই কেটে ফেলবে। দ্রুত সময়কে কাজে লাগিয়ে আক্রমণ করতে হবে।

(খ) মাঃ মাকান বা স্থান। কোথায় মারবো? কুরআনে আছে,

-তোমরা তাদের গর্দানের ওপর মারো আঙুলের আগায় আগায় মারো।

আমরাও আমাদের কৌশলগুলো এভাবে সাজিয়েছি। মাথা ও হাতকে মূল ধরে প্যাঁচগুলো তৈরী করেছি।

(গ) কিতালঃ লড়াই। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে বলেছেন,

-তোমাদের ওপর কিতাল ফরয করা হয়েছে।

এই আয়াত পড়ে আমার মনে হলো, কুরআনের ভাষ্য অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব একটা কিতাল-পদ্ধতি থাকা দরকার। এজন্য পুরো বিশ্ব থেকে মাল-মশলা সংগ্রহ করতে গিয়েছি। দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছি। কুরআনের আয়াতকে বাস্তবায়ন করার তাগিদে।

-আপনার কৌশলের কথাও কি কুরআনে আছে?

-হুবহু তো কিছু থাকে না। তবে আমাদের পুরো শিল্পটাই দাঁড়িয়ে আছে কুরআন কারীমের কয়েকটা আয়াতের ওপর।

=ফেরাউন শাস্তি জাদুকরদেরকে শাস্তির ভয় দেখানোর সময় কী বলল? সে বলল,

-আমি তোমাদের হাত-পা কাটব 'খিলাফী' পদ্ধতিতে। অর্থাৎ বিপরীত দিক থেকে। ডান হাত কাটলে কাটব বাম পা।

শুধু ফেরাউনই নয়, আল্লাহ অপরাধীকে শাস্তি দেয়ার সময়ও এই পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলেছেন।

আমার মাথায় এল, অন্যায় প্রতিরোধ বা প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার ক্ষেত্রেও এই ধারা অনুসরণ করলে কেমন হয়? ভাবতে ভাবতেই মাথায় এল,

= আক্রমণ বা আত্মরক্ষা। খিলাফি বা মুয়াযি। আবার লড়াইটা হাতে হবে বা পায়ে, কিংবা লাঠিতে। তিন ক্ষেত্রেই আমরা দুইটা সূত্র মেনে চলি,

ক) মুয়াযি। মানে আক্রমণ এলে ঠেকানো। ব্লক দেয়া।

খ) খিলাফি। পাল্টা আক্রমণ।

আমাদের লড়াই শুরুই হয় মুয়াযি বা ব্লক করা দিয়ে। তার মানে আমরা প্রথমে আক্রমণ করি না। গায়ে পড়ে যেচে মারামারি বাঁধাই না। ঠেকায় বা দায়ে পড়লে বাধ্য হয়ে লড়তে নামি। কারণ আমার শক্তি আছে বলেই হুড়ুদ্দুম কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবো এমনটা কুরআন আমাদের শিক্ষা দেয় না। কুরআন আমাদের ক্ষমা করতে শেখায়। আর ক্ষমা তো শক্তিমানেরই সাজে। দুর্বল ক্ষমা করবে কিভাবে?

আমাদের আরেকটা দর্শন হল,

= পেইন থেরাপি। অর্থাৎ ব্যাথা দেয়া। আমরা যখন প্রতি আক্রমণ করি, নিয়ত থাকে আত্মরক্ষা। পাশাপাশি এটাও খেয়াল রাখি, অন্যায়কারীকে আঘাত করলে সওয়াব হবে। এবং মাঝে মধ্যে শরীরে ব্যাথা লাগলে, শরীর বেশি সুস্থ থাকে। এজন্য সময় সময় একটু আধটু ব্যাথা পাওয়া দরকার।

-আপনার কৌশলকে বিশ্বসেরা বলে দাবি করছেন! এই কৌশল দিয়ে 'ব্রুস লি'কেও কি হারানো সম্ভব?

-আমরা কুরআনকে মেনেই এই শিল্প গঠন করেছি। আমাদের পদ্ধতি অবশ্যই বিশ্বসেরা। এতে কোনও কোনও সন্দেহ নেই। আমার ৬০ বছরের অভিজ্ঞতার নির্যাস হলো যামাকিতাল। আর ব্রুস লির কথা বলছেন? তার সাথেও আমার লড়াই হয়েছিল। লড়াই না বলে মুখোমুখি হয়েছিলাম বললেই ভাল।

-কখন? জিতেছিলেন?

-আমি তখন জার্মানিতে। জার্মানির হয়েই যুক্তরাষ্ট্রের এক মার্শাল আর্ট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করতে গিয়েছিলাম। ১৯৭২ সালে। সেখানেই দু'জন মুখোমুখি হয়েছিলাম। আমাদের কৌশল অনুযায়ী প্রতিপক্ষকে মুয়াযি মানে আক্রমণ করতে দিলাম। ব্লক করে একটা 'কুরআনী' খিলাফি হাঁকাতেই ব্রুস লি মিয়া কুপোকাত হয়ে মাটিতে পড়ে কাৎরাতে শুরু করলো। আমি হাঁক ছেড়ে বললাম,

-ইয়া হাবশী কুম! হেই ব্যাটা, ওঠ! লড়াই কর!

কিন্তু সে লড়াই চালিয়ে যেতে অস্বীকার করলো।

-বলছেন কী? এতবড় ঘটনা পত্র-পত্রিকায় এল না যে?

-জার্মানির পত্রিকায় সে খবর এসেছিল এটা জানি। খোঁজ করলে পাওয়া যাবে। আর ব্রুস লি হলিউডের কারণে বিখ্যাত হয়েছিল। তাই বলে সে সেরা ফাইটার, এমনটা ভাবা ঠিক নয়।

-কিন্তু তাই বলে সে একদম আনাড়িও তো নয়?

-তা অবশ্য নয়। কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকেই জিহাদি ও কিতালি পরিবেশে বেড়ে উঠেছি। একদম বাচ্চাকাল থেকেই ফরাসীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছি। আমাদের আমীরগণ প্রতিটা অভিযানের আগে দুইটা কথা বলতেন,

১. কাফেররা হলো শয়তানের বন্ধু। তারা শয়তানের কাছ থেকেই কৌশল শেখে। কুরআন বলে, শয়তানের কৌশল দুর্বল। আমাদের চিন্তা কিসের? আমরা দুর্বলের বিরুদ্ধে লড়তে যাচ্ছি। আমাদেরই জয় হবে। সেটা হয়েছে তো। ফরাসীদেরকে আমরা তাড়িয়ে দেইনি?

২. কুরআনে আছে, একজন মুমিন ধৈর্য ধরে ময়দানে টিকে থাকলে দশজন কাফিরকে প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। আমরা ধৈর্য ধরে ময়দানে থাকলে, প্রতিপক্ষ পরাজয় বরণ করতে বাধ্য! কুরআনেরই কথা!

সবসময় পাগড়ি পরে থাকতেন জীবনের দীর্ঘ সময় অমুসলিম দেশে কাটিয়েছেন। কিন্তু ইসলামকে ছাড়েননি। পুরোপুরি সুন্নাত তরীকায় দাড়ি রাখতেন। হক কথা বলতে ভয় পেতেন না। বাতিলের কাছে মাথা নোয়াতেন না। ২০১২ সালে এই মহান মানুষ ইহজীবন ত্যাগ করেন।

জীবন জাগার গল্প: ৬০৬

বিরল ইখলাস

ইমাম মাওয়ারদি (রহ.)। তিনি সারা জীবনে অসংখ্য কিতাব রচনা করেছেন। কিন্তু তার জীবদ্দশায় একটা কিতাবের কথাও কেউ জানতে পারেনি। ইলমের প্রায় প্রতিটি শাখাতেই তার রচনা ছিল।

যখন তার মৃত্যু ঘনিয়ে এল, তিনি তার একজন আস্থাভাজন লোককে বললেন,
-অমুক স্থানে গেলে দেখবে কিছু কিতাব লুকিয়ে রাখা আছে। সেগুলো আমার লিখিত কিতাব। যখন আমি মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবো, আমার মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হয়ে গেছে বলে তোমার মনে হবে, তোমার হাতটা আমার হাতে রাখবে।

আমার রূহ কবজ হয়ে যাওয়ার পর, আমি যদি তোমার হাতটা আঁকড়ে ধরে থাকি, তুমি বুঝে নিবে আমার এতসব রচনা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়নি। তখন রাতের আঁধারে সবগুলো পাণ্ডুলিপি বস্তায় ভরে দজলার পানিতে নিয়ে ফেলে দিবে।

আর যদি আমি আমার হাতটা ছড়িয়ে দেই বুঝে নেবে, আমার সারা জীবনের সাধনা আল্লাহর দরবারে মকবুল হয়েছে। সেগুলো মানুষের মাঝে প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করবে।

রূহ কবজ হওয়ার পর দেখা গেল তিনি হাতকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

জীবন জাগার গল্প:৬০৭

বাসর রাতের কান্না

এক মেয়ের স্মৃতিচারণ:

আমার হবু স্বামীকে আগে কখনো দেখিনি। পরিচয় তো দূরের কথা। বাসর রাতেই তার সাথে প্রথম দেখা।

সারা দিনের ব্যস্ততা শেষ হয়ে গেছে আমাকে বাসর ঘরে দিয়ে সবাই ঘুমুতে চলে গেছে। একাকী বসে আছি। স্বামীর অপেক্ষায়। তিনি এলেন। পালঙ্কের ওপর বসে আছি। অবনতমস্তক। জড়োসড়ো। অবগুণ্ঠিত। কুণ্ঠিত।

✍✍✍

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছি। ভাবছি তিনি পুরুষ। তিনিই তো আগে বেড়ে কথা বলবেন। আড় ভাঙবেন। কিন্তু তার পক্ষ থেকে কোনও সাড়া শব্দ নেই। ভয় পেতে শুরু করলাম। উদ্বেগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। লজ্জা ক্রমশ আতংকে পরিণত হচ্ছিল।

✍

লোকটা কথা বলছে না কেন, কিছু করছে না কেন? আমার কাছে আসছে না কেন? তার কী হয়েছে? আমি ভাবনার অতলে ডুবে থেকেই অজান্তে পাশ ফিরে বসলাম। দৃষ্টি তখনো নীচের দিকে। মানুষটা কি এতটাই লাজুক? না আমাকে পছন্দ হয়নি? আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

✍

নাহ এটা হতে পারে না। আমাকে অপছন্দ করার তো কোনও কারণ নেই। অন্তত সৌন্দর্যের বিবেচনায়। আমি জানি, আমার পরিবার জানে আমি দেখতে-শুনতে হেলাফেলার নই। এটা সেই ছোটবেলা থেকেই শুনে আসছি।

✍

আর মানুষটা তো আমাকে আগেই দেখেছে। তখনো অবশ্য আমার সাথে কথা বলেনি। আমিও আর আগ বেড়ে কথা বলতে যাইনি। বেশরম বাচাল মেয়ে মনে করে বসে কিনা, তাই।

আম্মু তো একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, ছেলেরা লাজুক মেয়ে পছন্দ করে। বাচাল আর দুর্মুখ-মুখরা মেয়েকে তারা একদম দেখতে পারে না

✍

আমি বসে বসে বিসমিল্লাহ, লা হাওলা, আয়াতুল কুরসী, আরো যা কিছু মনে আসছিলো সমানে পড়ে যাচ্ছিলাম। কিছুতেই কিছু হলো না। লোকটা কি বোবা? না তা কী করে হয়, আব্বু তো বলেছেন, ছেলেটা চমৎকার গুছিয়ে কথা বলতে পারে। তার কথা বলার ভঙ্গিটা নাকি অতুলনীয়। ভাইয়াও তার বাকপ্রতিভায় সপ্রশংস। তার মুখে গল্প শুনলে নাকি মুর্দাও হাসতে শুরু করবে।

✍

সেই কথকপ্রবর চুপটি করে থাকার কারণ কী? হঠাৎ সন্দেহ হলো, লোকটা কামরায় আছে তো! আমি থাকতে না পেরে টুপ করে মুখ তুলে তাকালাম। আবার দ্রুতই নামিয়ে ফেললাম। আমার এই নড়াচড়া লোকটা খেয়াল করল না।

✍

তারপর আবার ধীরে ধীরে মুখ তুলে তাকালাম। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে। অবাক হয়ে দেখলাম লোকটা এই দুনিয়াতে নেই। অন্য কোনও লোকে আছে। আমার অস্তিত্ব ভুলে ছাদের দিকে তাকিয়ে আছে। তার বিষণ্ন চেহারায় গভীর চিন্তার ছাপ।

✍

অকস্মাৎ লোকটা দুলে উঠলো। আমি চমকে উঠে ভাবলাম, এবার হয়তো আমার দিকে তাকাবে আমাকে ড্যাবড্যাব করে জুলজুল চোখে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতে দেখে কি না কী ভাবে! কিন্তু আমার ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে, লোকটা ঘড়ির দিকে তাকাল। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপও করল না। বসে বসে দাঁত দিয়ে নখ খুঁটতে লাগল।

✍

আমার বিস্ময় ততক্ষণে শোকে পরিণত হয়েছে। অপমানে আমার বুক ভেঙে কান্না আসতে শুরু করলো। অনেক কষ্টে চাপা দিয়ে রাখলাম। কিন্তু চোখের

আঁসু তো বাধা মানছে না। বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো বুক ভাসিয়ে দিচ্ছিল। কান্না থামাতে গিয়ে বারবার হিক্কা উঠছিলো। গমক থামাতে গিয়ে ফোঁস ফোঁস আওয়াজ বেরিয়ে গেলো। আর বাধা মানলো না মন। কান্নার আওয়াজ একটু জোরেই হয়ে গেল। আনন্দের ক্ষেত্রটা কান্নার কারবালায় পরিণত হয়েছে।

✍

আমার আকুল কান্না দেখে লোকটা পায়ে পায়ে কাছে এল। অদ্ভুত ঘড়ঘড়ে গলায় প্রশ্ন করল,

-কাঁদছ কেন?

জবাব না দিয়ে চুপ করে রইলাম। লোকটা এবার বলল,

-শোন, আয়েশা! আমি তোমাকে তালাক দিলাম।

✍✍✍

ঘরে বাজ পড়লেও আমি এতটা অবাক হতাম না। কামরা আগেও নীরব ছিল। এবার যেন পিনপতন নিরবতা ছেয়ে গেলো। চোখের পানি থেমে গেল। কাঁদতে পর্যন্ত ভুলে গেলাম। আমি হাঁ হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম। লোকটা কি মশকরা করছে? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো! বুকটা পুরোপুরি ফাঁকা হয়ে গেল। কেমন যেন চিনচিনে ব্যথা করতে লাগল। মনে হতে লাগল পুরো পৃথিবী দুলে উঠেছে। চারপাশ চরকির মতো ঘুরছে। দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এল। এরপর আর কিছুই মনে নেই।

✍

পরদিন নিজেকে আম্মুর বিছানায় আবিষ্কার করলাম। চোখ খুলেই দেখলাম আম্মু খাটের একপাশে বসে মাথা কুটে কাঁদছেন। আব্বু জানালার ধারে একটা চেয়ারে বসে দাঁত কিড়মিড় করে বলছেন,

– সে যে আমার ওপর এভাবে প্রতিশোধ নিবে ঘুর্ণাক্ষরেও টের পাইনি। আমি তো ভেবেছিলাম সব চুকেবুকে গেছে। তোর মনে এত বিষ থাকলে আমাকে মেরে ফেলতি। কিন্তু আমার কলিজার টুকরা মা'কে কেন...... ।

একথা বলে আব্বুও হু হু করে কাঁদতে লাগলেন। একটু পরে ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁতে দাঁত পিষে বললেন,

-এর প্রতিশোধ আমি নেবই নেব।

✍

যার সাথে আমার বিয়ে হয়েছিল তার বাবার সাথে আব্বুর বন্ধুত্ব সেই ছেলেবেলা থেকে। তারা ছিল গরীব। দাদাজানই সাহায্য-সহযোগিতা করে এতদূর টেনে এনেছিলেন। পরে বিয়েও করিয়েছেন। বাবার সাথে একটা ব্যবসায় জুড়ে দিয়েছিলেন। ব্যবসা করতে গিয়েই সেই আঙ্কেলের আসল রূপ দিনদিন প্রকাশ পাচ্ছিল। একসময় ষড়যন্ত্র করে আমাদের কোম্পানীর মালিকানা পুরোটাই নিজের নমে করে ফেলতে চেয়েছিলেন।

✍

আব্বু জানতে পেরে সাথে সাথে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন। আঙ্কেলকে বের করে দিয়েছিলেন। আঙ্কেল অবশ্য ততদিনে নিজের আখের ভালই গুছিয়ে নিয়েছেন। এ পরাজয়কে অবশ্য তিনি ব্যক্তিগতভাবে অপমান হিশেবে নিয়েছিলেন। তিনি বলতেন,

-এ অপমানের শোধ আমি তুলব।

✍

পরে আস্তে আস্তে আঙ্কেল নানা ছুতোয় আব্বুর কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে শুরু করলো। নিজস্ব কোম্পনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠান-উপাচারে আব্বুকে প্রধান অতিথি হিশেবে দাওয়াত দিতে লাগল। আম্মু বারবার নিষেধ করেছিলেন।
-এমন মানুষের সাথে আর সম্পর্ক রাখার কী প্রয়োজন? এরা পারে না এমন কাজ নেই। যে লোক দিনমান প্রতিশোধ নিবে বলে হাজারবার প্রতিজ্ঞা করেছেন সে লোক সহজে ভুলে যাবে বলে মনে হয় না।

-আরে না রেহানা, সে তার ভুল বুঝতে পেরেছে।

✍

ব্যবসা আলাদা কিন্তু আবার পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠলো। সে সম্পর্কের জের ধরেই আঙ্কেলের ছেলে, আমেরিকা ফেরত শিহাবের সাথে আমার বিয়ের বন্দোবস্ত। বিদেশে থেকেও সে এতটা কুটিল-জটিল রয়ে গেছে এটা ছিল আমার কাছে কল্পনাতীত। সেও বাবার সাথে কূট-ষড়যন্ত্রে শামিল হলো।

✍✍✍

দ্বিতীয় পর্ব

আমি স্রেফ দুই পরিবারের পুরনো রেষারেষির শিকার। ব্যবসায়িক কোন্দলের খাঁড়ার ঘা আমার ওপর এসে পড়েছে। আমার ওপর কেন এল এই খড়গ? আমি তো কারো ক্ষতি করিনি? কেন আমার ভবিষ্যতটাকে ভেঙে খানখান করে দেয়া হলো? ফুলের মতো নিষ্পাপ একটা জীবনকে ছত্রখান করা হলো?

✍

শুয়ে শুয়ে এসবই ভাবছিলাম। বুক চিরে দীর্ঘশ্বাসের মিছিল বের হচ্ছিল। বাসর রাতেই কালো দাগ লেগে গেল, ভবিষ্যতটা কেমন যাবে? আমার এখন আর কান্না আসছে না। ভেতরে কেমন যেন আগুন জ্বলছিল। তড়াক করে শোয়া থেকে উঠলাম। আব্বুর সামনে গিয়ে বললাম,

-আব্বু! আপনি কষ্ট পাচ্ছেন কেন। আপনি তো অনুতপ্ত হওয়ার মতো কিছু করেননি। আমিও এ ধাক্কা সামলে উঠবো।

আব্বু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। তার দু'চোখ ক্রমশ ঝাপসা হয়ে উঠছিলো। দ্রুত আমার কামরায় ফিরে এলাম। আব্বুর ভেঙে পড়ার দৃশ্য দেখার হিম্মত হলো না। আম্মু নির্বাক হয়ে শুধু তাকিয়ে থাকলেন।

✍

সারাটা দিন ঘরে শুয়ে-বসে কাটিয়ে দিলাম। আস্তে আস্তে মাথা কাজ করতে শুরু করলো। রাতে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফোনটা হাতে নিলাম। নতুন একটা সিম ঢুকিয়ে নির্দিষ্ট নাম্বারে কল দিলাম। গলার আওয়াজকে যথসম্ভব নিচু করে কথা শুরু করলাম,

-হ্যালো! রাবওয়া বলছি, হিকমাহ আছে?

-না তো, এখানে তো কোন হিকমাহ থাকে না!

-আপনি হিকমার বড় ভাই না?

-না, আমি তো শিহাব। আমার কোনও বোন নেই।

-দুঃখিত, আমি আপনাকে বিরক্ত করে ফেলেছি। ভুল নাম্বারে কল চলে গেছে।

-না না, কোনও সমস্যা নেই। ঠিক আছে। এমন হতেই পারে।

✍
কল শেষ করে মনে হলো শরীর দিয়ে হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হচ্ছে। ঘৃণায়, রাগে শরীরটা রি রি করতে লাগলো। মোবাইলের ওপর থু থু দিয়ে বসলাম। এটা দিয়ে সে পাপিষ্ঠ-নরাধমের কথা শুনেছি আমি?

কিন্তু নিজেকে প্রবোধ দিলাম। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে। রাগলে চলবে না। তাহলে সব ভেস্তে যাবে। ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

✍
মধ্যখানে একদিন বিরতি দিলাম। পরদিন রাতে আবার কল দিলাম।

-হ্যালো হিকমা! কাল কলেজে যাবি তো!

-দুঃখিত, আমি শিহাব

-এই যাহ, আবারও রঙ নাম্বার! কী যে হলো, বারবার একই ভুল কেন হচ্ছে?

-ভুল হলে হোক, সমস্যা নেই। হিকমা না হলেও কথা বলতে তো বাধা নেই।

✍
সেদিন থেকে শুরু হলো। পরিকল্পনামাফিক ছক এগুতে থাকল। আমি যা ধারণা করেছিলাম তার চেয়েও দ্রুত সে সাড়া দিতে লাগল। যেন সে এতদিন আমার অপেক্ষাতেই ছিল। আমার প্রতিজ্ঞা দিনদিন কঠোর থেকে কঠোরতর হচ্ছিল। আমার জীবনটা সে যেমনি ভাবে তছনছ করে দিয়েছে, আমি তাকে একটা তছনছে জীবন উপহার দেব।

✍
আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগলো। শিহাব আমাকে দেখার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠলো। আমি কোমলভাবে এড়িয়ে যাচ্ছিলাম। সে বলল,

-তোমার মত এত ভদ্র, কোমল মানুষ আমি আর দেখিনি। এত সুন্দর করে কথা বলতে আমেরিকাতেও কাউকে দেখিনি।

ক্রুর হাসি দিয়ে বললাম,

-শুনেছেন, হয়তো খেয়াল করেননি।

✍

আরও কয়েকদিন পর, সে আমাকে সরাসরি বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসলো। আমি হেসে বিদ্রূপের স্বরে বললাম,

-না দেখেই প্রস্তাব দিচ্ছেন?

-দেখার দরকার নেই। কথা শুনেই বুঝতে পারছি তোমাকে ছাড়া আমার ইহজীবন বৃথা।

-আমি তো এখনই বিয়ের কথা ভাবছি না। আগে লেখাপড়া শেষ করে নিই, তারপর অন্য কিছু।

-কিন্তু আমি তো তোমাকে ভীষণভাবে চাইছি। তুমি আমাকে বাঁচাও!

-আমি কিভাবে বাঁচাব?

- আমি আমেরিকা থাকতেই আমার বিয়ে পারিবারিকভাবে ঠিক হয়ে ছিল।

-কার সাথে?

-চাচাত বোন নাজিয়ার সাথে।

-তো বিয়ে করে ফেলছেন না কেন?

-মধ্যখানে অন্য একটা কাজ ছিল, সেটা সারতে একটু সময় লেগেছে। এখন তো আর কোনও কাজ নেই। তাই আব্বু আর চাচাজান উঠে পড়ে লেগেছেন। এবার আর ছাড় নেই। কিন্তু আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতে পারব না!

-আচ্ছা, আমার খুব ইচ্ছে করছে আপনার চেহারাটা দেখতে। আপনি একটা ঠিকানায়, আপনার স্বাক্ষর করা একটা ছবি পাঠাতে পারবেন?

-অবশ্যই পারব। আমি কালই পাঠাচ্ছি।

✍

পরদিনই আমি নির্দিষ্ট জায়গায় ছবির প্যাকেটা পেলাম। একটা নয় অনেকগুলো ছবি। সবগুলোর পেছনেই হাবিজাবি লেখা। নানা রঙঢঙের কথা লেখা। আমি মুচকি হেসে সব পার্সে ঢুকিয়ে রাখলাম।

✍

এক মাস পরে শিহাব ফোনে জানাল, তার বিয়ের তারিখ ঠিক হয়ে গেছে। এ বিয়েতে তার মোটেও মত নেই।

-আমার তো বিয়ে ঠেকিয়ে রাখার আর কোনও রাস্তা খোলা নেই। তোমাকে বিয়ের আগে একবার হলেও দেখতে চাই। তুমি কি অন্তত বিয়ের আসরে হলেও হাজির হতে পারবে?

-কী বলছো তুমি! তুমি বিয়ের দিনও আরেকজন বেগানা নারীকে দেখতে চাচ্ছ? তুমি তো সাংঘাতিক মানুষ!

-তুমি আমার সম্পর্কে আর কিইবা জান। আমি আরও বড় কিছুও করতে পারি। করেছিও।

-একটু বলো না গো!

-নাহ, থাক সেসব। এখন তুমি বিয়েতে আসবে কি না বলো!

-আমার আসাটা কি ঠিক হবে? তুমি সেদিন তো নতুন বউকে নিয়েই থাকবে। সেটাই ভালো।

-না সেটা মোটেও ভাল হবে না। আমি তাকে একদম পছন্দ করি না।

-কেন, তাকেই তো তোমার পরিবার আগে থেকে ঠিক করে রেখেছিল। তুমিও তাকে পছন্দ করতে!

-তা হোক, তাকে এখন আর পছন্দ হয় না।

✍

বিয়ের দিন ঘনিয়ে এল। আমিও সবকিছু গুছিয়ে রাখলাম। তার পাঠানো ছবিগুলোর আরও কপি করিয়ে রাখলাম। বিয়ের দিন সবাই আসরে উপস্থিত। একটু পরেই আকদ শুরু হবে। আমি কয়েকজনকে দিয়ে ঘরে-বাইরে বিভিন্ন জনের কাছে, ছবিগুলো পাঠালাম। সাথে একটা করে সিডি। আমাদের এতদিনকার কথোপকথনের অডিও।

✍

এরপরের ঘটনাগুলো বেশ দ্রুত ঘটলো হুলুস্থুল কাণ্ড বেঁধে গেল। রীতিমতো মারামারি লাগার মতো অবস্থা। কনে পক্ষ তার আত্মীয় হলেও, বিয়ের মঞ্চেই কনের বড় ভাই, মানে শিহাবের চাচাত ভাই ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

-ব্যাটা নিমক হারাম! তোকে আমরা টাকা খরচ করে আমেরিকা থেকে পড়িয়ে আনলাম। আর তুই কিনা এমন দাগা দিলি!

আরেক জায়গায় গাদ্দারি করে তোরা পথের ফকির হয়ে রাস্তায় ঘুরঘুর করছিলি। উঠিয়ে এনে উঁচু আসনে বসালাম আর তুই কিনা এই প্রতিদান দিলি!

✍

দিন গড়িয়ে রাত হলো। আমি সময় মতো ফোন করলাম,

-ওহ! রাবওয়া বাঁচালে! তোমার ফোনের অপেক্ষাতেই এতক্ষণ বসে ছিলাম।

-কেন? তোমার না আজ বাসর রাত?

-না রাবওয়া, আজ অনেক কিছু ঘটে গেছে। তোমাকে পাঠানো ছবিগুলো কিভাবে যেন কনেপক্ষের হাতে পড়েছে। রাবওয়া! তুমি ছবিগুলো কি কাউকে দিয়েছিলে?

-আমি তো রাবওয়া নই।

-কে তুমি?

-আয়েশা!

জীবন জাগার গল্প: ৬০৮

আসল আশ্রয়

উস্তাদ: ধর শয়তান তোমার মনে কোনও পাপচিন্তা উদ্রেক করলো। তখন তুমি কী করবে?

শাগরিদ: মুজাহাদার মাধ্যমে তা প্রতিহত করবো।

-আবার এলে?

-আবার প্রতিহত করবো?

-আবার এলে?

-আবারও প্রতিহত করবো!

-কিন্তু এটা তো স্থায়ী কোনও ব্যবস্থা নয়। তুমি কয়বার প্রতিহত করবে?

✍

-ধরো তুমি একপাল ছাগলের পাশ দিয়ে যাচ্ছ, তোমাকে দেখে পাহারাদার কুকুরটা বিকট স্বরে ঘেউ ঘেউ করে উঠলো। তোমার ওপর হামলা করার

উপক্রম। তুমি কী করবে? কিভাবে পথটুকু পার হবে?

-আমি যে কোনও ভাবেই হোক কুকুরটাকে ঠেকানোর চেষ্টা করব।

-কিন্তু প্রতিবারই তো তোমাকে এ পথ পাড়ি দিতে গেলে, সমস্যার মুখোমুখি হতে হবে!

-তাহলে আমি কী করব?

-তুমি কুকুর মালিকের দ্বারস্থ হবে! সেই তোমাকে কুকুর থেকে বাঁচিয়ে পার করে দিবে।

-শয়তান থেকে বাঁচার জন্যেও তোমার উচিত হলো তোমার রবের আশ্রয় প্রার্থনা করা। যেমনটা মারয়ামের আম্মা করেছিলেন। তিনি বাড়তি কোনও উপায় অবলম্বন না করে, সরাসরি মূল জায়গাতে চলে গেছেন।

= আমি তাকে ও তার বংশধরগণকে অভিশপ্ত শয়তান থেকে, আপনার আশ্রয়ে অর্পণ করলাম। (আলে ইমরান)

জীবন জাগার গল্প: ৬০৯

বেদুঈনের দুআ

এক বেদুঈন কা'বা-চত্বরে বসে বসে, কা'বার দিকে তাকিয়ে, বিড়বিড় করে কী যেন বলছে আর আঙুল তুলে ওপরের দিকে ইশারা করছে।

বদুর এ-অস্বাভাবিক আচরণ দেখে একজন এগিয়ে এসে জানতে চাইল,

-কী করছ?

-আল্লাহর সাথে কথা বলছি।

-কী বলছ?

-কথা বলতে আসলে, আমি দুআর মধ্যে আল্লাহকে একটা প্রশ্ন করছিলাম।

-কী প্রশ্ন?

-প্রশ্নটা হল,

= ইয়া আল্লাহ! আমি আপনার কাছে চাইনি, তবুও আপনি আমাকে ইসলামের মতো এতবড় একটা নেয়ামত দিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি প্রতিদিন আপনার কাছে জান্নাত চাইছি। চাওয়ার পরও আপনি দিবেন না কেন? আমি মৃত্যুর পর না চাইতেই যেন জান্নাত পেয়ে যাই!

জীবন জাগার গল্প : ৬৯০

জুলুমের পরিণাম!

মিশরে খেদিভ ইসমাঈলের শাসন চলছে। দেশে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। দারিদ্র-অভাব-অনটনের কারণে মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাতে লাগল।

রাষ্ট্রীয় কোষাগারেও যোগান-সংকট দেখা দিল। ইথিওপিয়াতে মোতায়েন করা মিশরী সেনাদের কাছে রসদ পৌছানোতে ঘাটতি দেখা দিল। সৈন্যদের মধ্যেও চরম অস্থিরতা বিরাজ করছে! সে এক চরম অরাজক পরিস্থিতি!

✍

খেদিভ দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে বসলেন, কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়! কোনও সমাধান বের হল না

আযহারের শায়খগণের সাথে বসলেন। তাদেরকে আদেশ দিলেন,

-দেশের জন্যে বেশি বেশি দু'আ করুন। আর বুখারী শরীফের খতম করান। সংকট দূর হওয়া পর্যন্ত এটা চলতে থাকুক।

✍

কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। অবস্থা দিনকে দিন আরও অবনতির দিকে গেল। খেদিভ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে শায়খগণকে বললেন,

-আপনারা কী দু'আ করছেন বলুন তো! কিছুই তো হচ্ছে না! হয় আপনারা সত্যিকার আলিমই নন, ভূয়া আলিম! অথবা আপনার বুখারী শরীফই চেনেন না, বুখারী শরীফ মনে করে অন্য কিছু পড়ছেন! অথবা আপনারা দু'আই করতে পারেন না!

✍

খেদিভের হুমকি-বক্তব্য শুনে পুরো মজমা নিশ্চুপ হয়ে গেল। কেউ কিছু বলার সাহস করে উঠতে পারল না।

✍

সবার নীরবতা দেখে, একজন শায়খ উঠে দাঁড়ালেন।

নির্ভীক-নিষ্কম্প-দৃঢ়কণ্ঠে বললেন,

-আপনি যাদের কাছ থেকে যুলুম করে সম্পদ লুট করে এনেছেন, তাদের লুণ্ঠিত দ্রব্য আগে ফেরত দিন। আপনি আগে, আপনার প্রজাদের ব্যাপারে তাকওয়া অবলম্বন করুন।

আপনার হয়তো জানা আছে, আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যক্তির জন্যে দুআ কখনোই কবুল করেন না, যার আমলানামায় বিন্দু পরিমাণও জুলুম আছে।

আপনার জুলুমের কুপরিণাম শুধু মিশরই ভোগ করছে না, সুদূর হাবাশাতেও গিয়েও এর ধাক্কা লেগেছে। আসলে হয়েছে কি জানেন আফেন্দী!

সমস্যা আলিম সমাজ বা বুখারী শরীফে নয়, সমস্যা মূলতঃ আপনার মধ্যে। সর্ষের ভেতরেই ভূত। আপনি ঠিক হোন, দেশ ঠিক হয়ে যাবে।

✍

নবীজি বলে গেছেন,

-তোমরা অবশ্যই অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করবে, অবশ্যই অবশ্যই অসৎ কাজে বাধা দিবে, নইলে আল্লাহ তোমাদের ওপর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেবেন। তখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা দু'আ করবে, কিন্তু দু'আ কবুল করা হবে না।

✍

খেদিভ ইসমাঈল এমন চরম তিক্ত সত্যকথন শুনে আর বেশি কিছু বলার সাহস পেল না . মাথা নিচু করে মজলিস ত্যাগ করে উঠে চলে গেল।

✍✍✍

এ মহান নির্ভীক শায়খের নাম আল্লামা তাওফীক আল বাতশাতী (রহ.)।

জীবন জাগার গল্প : ৬১১

বোতলের কমলা!

বিশাল কমলা বাগান। নানান জাতের কমলা আছে বাগানে। বাগানের পশ্চিম পাশে, নদীর তীরে কিছু বিশেষ জাতের কমলা আছে, সেগুলো আকারে বেশ বড় হয়। তুলনামূলক পুষ্টিকরও। সাধারণ ক্রেতাদের কাছে এগুলো বিক্রি করা হয় না। তারা চড়ামূল্যের কারণে এগুলো কিনতেও পারে না।

✍

কমলাগুলো পাকার সময় পর্যন্ত টিকিয়ে রাখতে বাগানের মালিককে বেশ বেগ পেতে হয়। কারণ সেগুলোর রঙ খুবই আকর্ষণীয়। পাখিরা এ-রঙ দেখে প্রলুব্ধ হয়। কচি থাকতেই তাদের আক্রমণ শুরু হয়।

✍

মালিক কৃষি বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করে, পাতলা কাঁচ দিয়ে বিশেষ এক ধরনের বোতল বানিয়ে আনলেন। বোতলগুলোর মোটাপেট আর চিকন মুখ। পরামর্শ মতো কমলাগুলো কড়া (কচি) থাকতেই বোতলে ঢুকিয়ে দেন। মুখ খোলা থাকার কারণে, আলো-বাতাসের সমস্যা হয় না। আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে বোতলের মধ্যেই। মাপমতো বানানো বোতলে কমলাগুলো বেশ রসালো আর টসটসে হয়ে ওঠে। পাখিরাও আর আক্রমণ করতে পারে না।

✍

মালিকের ছেলে থাকে শহরে। বাবার এসব ক্ষেত-খামার তার পছন্দ নয়। পড়াশুনা করে সেখানেই বিয়ে-থা করে থিতু হয়েছে। উৎসবে-পার্বণে-ইস্টারে বাবা-মায়ের সাথে দেখা করতে আসে।

✍

নিজে সশরীরে বাবার সাথে থাকতে না পারার কারণে ছেলের মনে সব সময় একটা চোরা অপরাধবোধ কাজ করে। এজন্যই বোধ হয়, তার প্রথম সংসারের ছেলেকে বাবার কাছে রেখে দিয়েছে। দাদার সাথে থেকে পড়ালেখা করুক। পাশাপাশি দাদার কাছ থেকে ক্ষেতি-গেরস্তিও একটু-আধটু শিখুক।

✍

প্রতিদিন সকালে দাদা-নাতিতে মিলে কমলা-বাগানে যায়। পাকা ফলগুলো তুলে শহরে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। দাদা সাধারণতঃ বিশেষ জাতের কমলালেবুগুলোর জায়গায় কাউকে নিয়ে যায় না। গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয়ে। কারণ এগুলো তার সারাজীবনের সাধনার ধন। অনেক দিনের চেষ্টার পর, বিশেষ কলমের মাধ্যমে এ জাতের কমলা আবিষ্কার করতে পেরেছে।

✍

দাদা আজ ঠিক করলো, নাতিকে কমলাগুলো দেখাবে। তার বোঝার বয়েস হয়েছে। নাতি এমন বিদঘুটে কমলা দেখে তো অবাক!

-কমলাগুলো এমন করে বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে কেন? আর এত বড় বড় কমলা বোতলের এমন সরু মুখ দিয়ে কিভাবে ঢোকানো হলো?

দাদা নাতির প্রশ্ন শুনে মজা পেয়ে গেলেন। বললেন,

-তোমাকে এসব বলব বলেই তো নিয়ে আসা। দাদা নাতিকে পুরা প্রক্রিয়াটা খুলে বললেন। নাতি ভীষণ অবাক হয়ে বললো,

-দাদাভাই! এত সহজ একটা বিষয়কে প্রথম দেখাতে আমার কাছে কী কঠিন আর অসম্ভব মনে হয়েছে! আমি তো ভেবেছিলাম এটা কী করে সম্ভব হলো? নিশ্চয়ই এগুলো আসল নয়!

-এগুলো আসল। ছোট কচিকড়া থাকতেই ব্যবস্থা করে ফেলাতে এ অসম্ভবকে সম্ভব করা গেছে তোমার বাবার কথাই ধরো না!

-বাবার আবার কী হয়েছে?

-আমি ভুল করে, তাকে ছোটবেলাতেই শহরে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। মনে করেছিলাম, লেখাপড়া শিখে সে আমার ইচ্ছা পূরণ করবে। ফল হয়েছে উল্টো।

যদি ছেলেবেলাতেইআমার চাষবাসের যোগ্যতাগুলো তাকে শেখাতে শুরু করতাম, তাহলে সেও আজ আমার মতো বড় একজন কৃষিবিদ হতে পারতো। আমাদের পারিবারিক বাগানটার দেখভাল করতে পারতো।

✍

তোমার ক্ষেত্রে আর ভুল করিনি। তোমার বাবার কাছ থেকে তোমাকে চেয়ে এনেছি। তোমার মায়ের মৃত্যুর পরপরই। চেষ্টা করেছি এবং করছি, তোমার স্কুলের পড়াশোনার পাশাপাশি, ছোটবেলাতেই, তোমার মধ্যে কিছু গুণাবলী চারিয়ে দিতে। যাতে করে বড় হয়ে গুণগুলো তোমার মধ্যে মহীরুহেপ আকার ধারণ করে! বাহ্যিক দৃষ্টিতে মনে হবে, কৃষি ফার্মে বেড়ে ওঠা একটা ছেলের মধ্যে তো এসব গুণ থাকার কথা নয়?

নাতি! আমার কথাগুলো তুমি এখন বুঝবে না! অনেক পরে, যখন বড় হবে, তখন আজকের কথাগুলো স্মরণ করো। তখন তো আমি থাকবো না, কিন্তু ঠিকই আমার উপস্থিতি তুমি টের পাবে।

জীবন জাগার গল্প: ৬১২

মায়ের ওম

সালেহ হাম্মুদ। জন্ম গাযায়। পড়াশুনা মিশরে। বেড়ে ওঠাও মিশরে। হামাসের হয়ে গোপনে মিসর থেকে বিভিন্ন 'সাপ্লাই' আনা-নেয়া করে। অবশ্য গোপন টানেল দিয়েই এসব লেনদেন হয়। ইসরাঈলী সীমান্তরক্ষীদের দৃষ্টি এড়িয়ে।

✍

দুনিয়াতে হাম্মুদের আপন বলতে এক বৃদ্ধা মা। বাকী পরিবারের সবাই ইহুদি বোমার আঘাতে শহীদ হয়ে গেছেন। সেই ছেলেবেলায়।

বাবা হামাসের সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে টার্গেট কিলিংয়ের শিকার হয়েছিলেন। ইহুদিরা চেয়েছিল পরিবারের সমস্ত পুরুষকে শেষ করে দিতে। আল্লাহর ইচ্ছায় হাম্মুদ বেঁচে গিয়েছিল। রাতের আঁধারেই গোপন টানেল দিয়ে, রাফাহ সীমান্ত দিয়ে মিশরের সিনাইতে এসে হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল। মায়ের জন্যে মন কেমন করলেও উপায় ছিল না।

✍

প্রাণের ঝুঁকি থাকার কারণে, মাকে দেখতে যেতে পারেনি দীর্ঘদিন। দূর থেকেই খোঁজ-খবর রাখতো। ফোন করাটাও ছিল ভীষণ ঝুঁকির। মোসাদ ট্রেস করে ফেলার সমূহ আশংকা ছিল।

✍

প্রায় বিশ বছর পর, এক বৃষ্টির রাতে, ইহুদিদের জাতীয় দিবসে, হাম্মুদ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, সীমান্ত পেরিয়ে মাকে দেখতে এল। মা এখন মরণোন্মুখ। অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। শেষবারের মতো দেখা হবে।

✍

সেই ছোট্ট ছেলেটি এখন তাগড়া যুবক। আগের সেই চেহারা নেই, শরীর নেই, তবুও দরজায় টোকার আওয়াজ শুনেই মা ভেতর বাড়ি থেকে, আমার হাম্মুদ এসেছে! আমার হাম্মুদ এসেছে বলে দৌড়ে এসে দরজা খুলে দিয়েছেন।

✍

হাম্মুদ ভীষণ অবাক হলো। সে তো মাকে বলেনি আসার কথা! কিভাবে টের পেলেন?

মা-ছেলেতে কথা শুরু হলো। এতদিনের কথা কি একরাতে ফুরোয়? তারপরও মা অসুস্থ শরীর নিয়ে, নিজ হাতে রান্না করে সন্তানকে খাওয়ালো। এ জীবনে আর হয়তো ছেলের সাথে দেখা হবে না। রান্না করে খাওয়ানো হবে না!

✍

খাওয়া-দাওয়ার পর, মা ছেলেকে জোর করে শুইয়ে দিলেন। অতি ভোরে আবার গিয়ে টানেলে ঢুকতে হবে। ইহুদিদের নাগালের বাইরে চলে যেতে হবে।

✍

হাম্মুদ ফজরের আযান শুনে ঘুম থেকে উঠলো। তাড়াহুড়ো করে ওজুটা সেরে নিবে। ফজর গোপন টানেলের কাছাকাছি কোথাও পড়ার খেয়াল। কিন্তু জুতো জোড়া খুঁজে পাচ্ছিল না

চারপাশ খোঁজার পর, তার চকিত মনে পড়লো, ছেলেবেলায় বৃষ্টির দিনে মা রাতের বেলা জুতোজোড়া উনুনের পাশে নিয়ে রাখতেন। যাতে সকাল বেলা শুকনো জুতো পায়ে দিয়ে ছেলে স্কুলে যেতে পারে। আজও তেমনটা ঘটেনি তো?

চুলার কাছে গিয়ে দেখে ঠিক তাই। মা তাকে আজও সেই কচি খোকাটি মনে করেছেন। তার ঘুমিয়ে পড়ার পর তার জুতোর কথা ভুলে যাননি। ঠিকই আগের মতো যত্ন করে গরম করতে দিয়েছেন।

✍

হাম্মুদ আবেগাপ্লুত হয়ে, জুতোজোড়ার কয়েকটা ছবি তুলে নিল। সাথে সাথেই দ্রুত হাতে তার টুইটার একাউন্টে একলাইনে ঘটনাটা লিখল। সাথে একটা ছবিও দিয়ে দিল।

✍

মায়ের কাছ থেকে জীবনের শেষ বিদায় নিয়ে নিল। হাতে সময় একদম নেই। আঁধার থাকতে থাকতেই টানেলে পৌঁছতে হবে। মা ছেলের হাত ধরে যতদূর আসা যায় হেঁটে আসলেন। দু'জনে চোখ মুছতে মুছতে একে-অপরের হাত ছাড়লেন। আখিরাতে দেখা হবে, দু'জনের মুখ দিয়েই কথাটা বেরিয়ে এলো।

✍

নিরাপদ দূরত্বে আসার পর, হাম্মুদ একটা জাইতুন বাগানে অপেক্ষা করছে। কী মনে করে তার টুইটার একাউন্ট খুলল। অবাক হয়ে দেখলো, তার ওয়ালে বন্যা বয়ে গেছে। লাইক আর কমেন্টের বন্যা। অথচ সে তেমন একটা পরিচিত নয়। একজন লিখেছে,

-আশ্চর্য! আমি তো ভাবতাম এ ধরনের ঘটনা শুধু আমাদের বাড়িতেই ঘটে! এখন দেখছি সে ধারণা ভুল!

✍

আরেকজন কমেন্ট করেছে,

-ভাই! মায়ের জন্যে কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম, মায়ের ওমের কথা ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি আবার....।

✍

আরেকজন লিখেছে,

-জুতোজোড়ার ছবি তো নয়, যেন আমার মায়ের ছবিই ভেসে উঠলো রে ভাই!

✍
আরেকজনের কমেন্ট,

-অনেক কথা মনে করিয়ে দিলে! রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানী সাগীরা!

✍
আরেকজন,

-ভাই! আমি মাকে হারিয়েছি সেই কবে, ভাল লাগছে একথা ভেবে, তোমার আম্মু এখনো আছেন!

✍
হাম্মুদ জলপাইয়ের ছায়ায় বসে, সিনাইয়ের ছাতিফাটা গরমে, দরদর ঘামছিলো আর কমেন্টগুলো পড়ে নয়নজলে ভাসছিলো।

জীবন জাগার গল্প: ৬১৩

পর্দানশীন বুড়ো

শায়খ জাবের আতওয়ান। একজন ব্যবসায়ী। তার স্মৃতিচারণ।

-আমি নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম। বিশেষ এক কাজে। আমাদের পারিবারিক ব্যবসার একটা চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে।

স্ত্রীও সাথে ছিলো। সে তখন অন্তঃসত্ত্বা। তাকে পরীক্ষা করার জন্যে আমি একটা হাসপাতালে গেলাম।

আমাদের পালা আসার অপেক্ষা করছি। আমার পাশেই একটা ছোট্ট ছটফটে বালিকা বসা ছিল। চেহারা আর পোশাক দেখেই বোঝা যাচ্ছিলো মেয়েটা আরব। কথার বলার পর, আরও নিশ্চিত হলাম। বালিকার ওপাশে একজন বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বসা ছিলেন। বালিকার দাদা।

✍
বৃদ্ধ লোকটির একটা আচরণ আমাকে কৌতূহলী করে তুললো। তিনি একটা শাদা রুমাল দিয়ে মাথা তো বটেই চোখ পর্যন্ত ঢেকে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পরপরই বৃদ্ধ রুমাল উঁচিয়ে নাতনিকে জিজ্ঞেস করছিলেন,

-ডাক্তার এসেছেন?

-জি না, আসেননি।

উত্তর শুনে আবার চোখমুখ ঢেকে ফেলছিলেন। মনে করলাম তার মুখে শ্বেতী বা পোড়া দাগ আছে। তাই তিনি সেটা কাউকে দেখাতে চাচ্ছেন না।

✍

একটু পর ডাক্তার এলেন। তিনি প্রথমে একা একা গেলেন। এই ফাঁকে চঞ্চল বালিকাকে জিজ্ঞেস করলাম,

-তোমার দাদুর কি চেহারায় কোনও সমস্যা আছে?

-না তো! কেন?

-এই যে, সারাক্ষণ মুখ ঢেকে রেখেছেন?

-ও এই ব্যাপার! আমার দাদু তো এখানে থাকেন না। তিনি আমাদের দেশ আলজেরিয়াতে থাকেন। বেড়াতে এসেছেন। আমার দাদু খুব ভাল মানুষ। তিনি দেশেও রাস্তায় বের হলে সব সময় চোখের ওপর রুমাল টেনে বের হন।

-কেন?

– দাদু বলেন, যাতে রাস্তার মহিলাদের ওপর চোখ না পড়ে। এখানেও আপনি দেখছেন না, ছোট্ট ছোট্ট পোষাক পরে, কত সুন্দর সুন্দর নার্স ঘোরাঘুরি করছে! তাদের ওপর চোখ না পড়ার জন্যেই দাদু এটা করেছেন। না হলে তার চেহারা তো কী সুন্দর!

জীবন জাগার গল্প: ৬১৪

ভাঙাগ্লাসের মিথ্যা!

কলেজ থেকে কিছু ছেলে ব্রিটেন যাবে। উচ্চাশিক্ষার্থে। স্কলারশীপ নিয়ে অধ্যাপক ওয়ালিদকে বলা হলো ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কিছু বলতে। কিছুক্ষণ চুপ থেকে তিনি বললেন,

-যারা এবার যাচ্ছো তারা তো বটেই, অন্যদেরও বলছি, আমার জীবন থেকেই ছোট্ট একটা ঘটনা শোনাবো এখন। মনোযোগ দিয়ে শুনবে আশা করি।

✍

আমরা সেবার বেশ কয়েকজন গিয়েছিলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রত্যেকের জন্যে একটা করে পরিবার ঠিক করে দিলো। আমরা তাদের সাথে থাকবো। ইংরেজীও শেখা হবে। ঘরোয়া পরিবেশেও থাকা হবে।

✍

আমি ভাগে পড়েছিল চমৎকার একটা পরিবার। সুখী। ভদ্র। সম্ভ্রান্ত। বনেদী। বাবা-মা ও পুতুলের মতো একটা মেয়ে।

✍✍✍

আমি এক সপ্তাহেই ঘরের মানুষ বনে গেলাম। তারাও আমাকে আপন করে নিলো। মেয়ে রোজেন তো আমার ন্যাওটা হয়ে পড়লো।

✍

একদিন তাদের ম্যারেজ এনিভার্সারি। তারা কোথাও ঘুরতে যাবে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে। আমাকে বললো,

-ওয়ালিদ! তুমি কি রোজেনকে কয়েক ঘণ্টার জন্যে রাখতে পারবে?

-অবশ্যই পারবো।

✍

রোজেন ছিলো খুবই চঞ্চল। সারাক্ষণ এটা সেটা নিয়ে ব্যস্ত। খেলছে। দুলছে। ছিঁড়ছে। হঠাৎ রান্নাঘর থেকে ঝনঝন শব্দ এলো। দৌড়ে গিয়ে দেখলাম, একটা চমৎকার কাঁচের জগ ভেঙে ফেলেছে।

✍

রোজেন তো ভয়ে কাঁদতে শুরু করে দিলো। আমি বললাম,

-তুমি চিন্তা করো না। আম্মু এলে আমি নিজেই বলবো, জগটা আমিই ভেঙেছি।

✍

তাই হলো। কিন্তু রোজেনের মনটা খুবই খারাপ। চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলাম,

-মুখ গোমড়া কেন?

-আম্মুর সাথে মিথ্যা বলেছি যে!

-ঠিক আছে, সত্যি কথাটা মাকে বলে দাও।

✍

পরদিন নাস্তার টেবিলে গৃহকর্তা আমাকে বিনয়ের সাথে বলল,

-কিছু মনে করো না ওয়ালিদ! আমরা মেয়েকে ছোটবেলা থেকেই সত্য কথা বলতে শিখিয়েছি। গতকালই প্রথম সে মিথ্যা কথা বলতে শিখল।

আমাদের খারাপ লাগবে, তবুও বলতে বাধ্য হচ্ছি, তুমি যদি অন্য কোথাও থাকার জায়গা করে নাও খুশি হবো। অবশ্য তুমি চাইলে বাড়ি খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকতে পারো!

✍✍✍

আমার প্রিয় ছাত্ররা! তোমরা কল্পনাও করতে পারবে না, সেদিন আমার কাছে কেমন লেগেছিল। এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল ছিল। আমি আমার দীনকে ভুলে, একটা বাচ্চাকে মিথ্যা বলতে উদ্বুদ্ধ করেছিলাম। তার শাস্তি আমি হাতেনাতে পেয়েছিলাম। তারপর থেকেই আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম,

= পরিস্থিতি যত কঠিনই হোক, মিথ্যা বলব না।

তোমরাও বাছারা! বিদেশ যাচ্ছ, যাও! কিন্তু তোমার দীনকে ভুলে যেও না! কোনও অবস্থাতেই না।

জীবন জাগার গল্প: ৬১৫

ঘড়ির চড়

পেশায় তিনি একজন বক্তা। বিভিন্ন সভা-সেমিনারে বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। মানুষকে সুন্দর সুন্দর কথা বলেন। ভালো হতে উদ্বুদ্ধ করেন। রোজগারপাতিও মন্দ হয় না।

আগামীকালের প্রোগ্রামটা পড়েছে শ্বশুরবাড়ির পাশে। স্ত্রী বায়না ধরলো,

-আমিও সাথে যাব। কতো দিন হলো মাকে দেখি না!

✍

নিজের গাড়ি থাকায় সুবিধেই হলো। পথে একটা অনুষ্ঠানে কিছু কথা বলতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে কিছু কথা বললেই হবে। স্ত্রীকে গাড়িতে রেখে বক্তব্য দিতে গেলো। মাইক থাকার কারণে, সভাস্থলের বাইরে থাকা শ্রোতারাও শুনতে পাচ্ছে। স্ত্রীও স্বামীর বক্তব্য শুনতে পেয়ে পুলকিত। স্বামীর কথাগুলো তার মনে আশার সঞ্চার করেছে। পাশাপাশি কিছুটা কৌতুকমাখা কৌতূহলও তার চোখে ঝিকিয়ে উঠেছে। বক্তা কথা শেষ করলেন,

-আমাদের কর্তব্য হলো একে অপরের সাথে ক্ষমার আচরণ করা। উদারভাবে অন্যের ভুলগুলো দেখা। আমরা যদি একে অপরকে ক্ষমা করতে না পারি, আল্লাহর কাছে কিভাবে ক্ষমার আশা করি?

✍

বক্তব্য শেষ হলো। তুমুল আগ্রহে সবাই বক্তার সাথে দেখা করতে এলো। বরাবরের মতোই এবারের বক্তব্যটাও বেশ হয়েছে। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তার কথা শুনেছে। গিলেছে।

✍

এবার আর কোথাও থামাথামি নয়। বক্তা নিজেই গাড়ি চালাচ্ছে। চালকের আজ ছুটি। স্ত্রীকে উসখুশ করতে দেখে বক্তা বললেন,

-কিছু বলবে?

-বলতে তো চাচ্ছি কয়েকদিন ধরে। আজ তোমার বক্তব্য শুনে মনে আশার সঞ্চার হয়েছে। মনে সাহস পাচ্ছি।

-এতো ভনিতা না করে বলেই ফেললেই পারো!

-বলছিলাম কি, তোমার একটা দামী ঘড়ি আছে না, সেটা আমি বিক্রি করে দিয়েছি!

-কী বলছো তুমি, কেন বিক্রি করলে?

-মায়ের সাথে বহুদিন হলো দেখা হয় না। তুমিও সময় দিতে পারো না। ইচ্ছা হচ্ছিলো মায়ের জন্যে একটা উলের গরম চাদর কিনি। হাতে টাকা ছিল না, তাই.....।

✍

স্বামী গাড়িটা রাস্তার পাশে হার্ডব্রেক কষে দাঁড় করালো। স্ত্রীর গালে সজোর এক চড় কষিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে বললো,

- আমার কাছে টাকাটা চাইলে কি আমি দিতাম না!

✍

স্ত্রী পাঁচ আঙুলের দাগ বসা গালে একটা হাত বোলাতে বোলাতে স্মিতাহাসি দিয়ে বললো,

-টাকা চাইলে দিতে কি না, সে-প্রসঙ্গ এখন থাক। তবে চড়টাতে খুব ব্যথা পেলেও, আমি তোমার তোমার আজকের বক্তব্য মানার চেষ্টা করছি। আর হ্যাঁ, ঘড়িটা কিন্তু তোমার হাতেই আছে!

জীবন জাগার গল্প : ৬১৬

বালিকার প্রজ্ঞা

রাজ্য ভ্রমণে বের হলেন রাজা। সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত পায়ে এক বাগানবাড়িতে ঢুকলেন। একটা বালিকা এগিয়ে এসে রাজাকে ঘরে নিয়ে বসালো।

-মা তুমি কি ঘরে একা?

-জি। আব্বু-আম্মু বেড়াতে গিয়েছেন। একটু পরেই চলে আসবেন।

-এত সুন্দর আনার বাগানটা তোমাদের?

-জি।

-আমাকে একটু পানি দিতে পারো, গলাটা বড্ড শুকিয়ে গেছে!

✍

বালিকা দৌড়ে গিয়ে একগ্লাস শরবত নিয়ে এলো। রাজা খুব তৃপ্তির সাথে পান করলেন।

-তুমি শরবতটা কী দিয়ে বানিয়েছো?

-আনার দিয়ে।

-কয়টা আনার লেগেছে?

-একটা।

-একটা আনারে এত রস? আমাকে মা! আরেক গ্লাস দাও।

✍

মেয়েটি চলে যাওয়ার পর, রাজা মনে মনে ভাবলেন,

= আমার রাজ্যে এত সুন্দর একটা আনার বাগান আছে আর আমি জানি না! এই বাগান আমার চাই মেয়েটা আধ গ্লাস শরবত নিয়ে এল রাজা শরবতটা মুখে দিয়েই ওয়াক থো করে ফেলে দিলেন,

-শরবতটা এত তিতা কেন? আগেরটা কতো মিষ্টি আর সুস্বাদু ছিল! কী দিয়ে বানিয়েছ?

-আনার দিয়ে।

-আগের গাছের আনার?

-জি।

-এবার শরবত কম কেন? কয়টা আনার দিয়েছ?

-পাঁচটা।

-তাহলে শরবতের মান ও পরিমাণ বদলে গেল কেন?

-সম্ভবত জাহাঁপনার নিয়ত বদলে গেছে!

জীবন জাগার গল্প : ৬১৭

একটি চিঠি

ছোটবেলা থেকেই, আফীফা খাস পর্দা করে আসছে। পারিবারিকভাবেই তারা খান্দানি পর্দানশীন। দাদীজান এত বৃদ্ধ হয়ে গেছেন, তবুও তিনি ঘরের উঠোনে যাওয়ার আগেও সময় নিয়ে পরনের কাপড় ঠিকঠাক করে বের হন। আম্মু আর বড় আপু তো বলতে গেলে যাকে বলে অসূর্যস্পর্শা (যাকে কোনও দিন সূর্যও দেখেনি)।

এমন পরিবারে বেড়ে উঠলে যা হয়, আফীফাও তাই হয়েছে। মাহরাম পুরুষ ছাড়া আর কেউ এই পর্যন্ত তার চেহারা দেখেনি। আফীফা তার পূর্ণাঙ্গ পর্দার ব্যাপারে খুবই যত্নবান। তার চিন্তা হল,

-আমার এই পুরো অবয়ব, এই কায়া কারো দেখার অনুমতি নেই। এটা আমি করছি আমার রবের ডাকে সাড়া দিয়ে। আর এটা আমাকে দেয়া, আল্লাহর পক্ষ থেকে একটা অমূল্য নিয়ামত ও আমানত। এই আমানত একজন স্বপ্নের রাজকুমারের জন্য। এক অনাগত শাহজাদার জন্য।

কিন্তু তাকদীরের লেখা ভিন্ন। অফীফা অসুস্থ হয়ে পড়ল। রক্তে সুগারের পরিমাণ কমে গেল। পাশাপাশি রক্তশূন্যতা দেখা দিলো। ডাক্তার নিয়মিত স্যাল্যাইন আর ভিটামিন ইঞ্জেকশন নেয়ার পরামর্শ দিলেন।

আফীফারা যে শহরে থাকে, সেখানে একটাইমাত্র হাসপাতাল। সেটাতে কোনও মহিলা ডাক্তার নেই। তাকে বাধ্য হয়েই পুরুষ ডাক্তারের হাতে ইঞ্জেকশন নিতে হল। প্রথমে সে হাতের কব্জির শিরাতেই ইঞ্জেকশন পুশ করতে অনুরোধ করল। ডাক্তার সিরিঞ্জ পুশ করতে ভুল করে ফেলল। হাতটা ফুলে গেল। পরে হাতের বাহুতে ইঞ্জেকশন নিতে হল। আফীফা বারবার

আল্লাহর কাছে পানাহ চাচ্ছিল। সে তো ইচ্ছা করে হাতের আবরণ উন্মোচন করছে না।

আব্বু অবশ্য পুরো সময়টা তার হাত ধরে তাকে একটানা অভয় দিয়ে গেছেন। তবুও সে পুরো সময়টা দু'চোখ বন্ধ করে আল্লাহকে ডাকছিল। আর চিন্তা করছিল,

-পর্দা তো শুধু এই নয় যে পুরুষ বেগানা মহিলার দিকে তাকাবে না, একজন বেগানা পুরুষের দিকে না তাকানোও একজন মহিলার পর্দার অন্তর্ভুক্ত। এই ব্যাপারটা দাদীজান বারবার বলেন। তিনি সুযোগ পেলেই বলেন,

-আফীফা বোন! তুমি নিজেকে অন্য পুরুষের চোখের খোরাক বানিওনা, আবার অন্য পুরুষকেও তোমার চোখের খোরাক বানিও না।

দাদীজানের কথাটা সে অক্ষরে অক্ষরে পালনের চেষ্টা করে। ডাক্তারের ইঞ্জেকশন দেয়া শেষ হলে, সে ওজু করে মাগরিবের নামায আদায় করল। জীবনের অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলোর জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইল। নামায শেষ করে আফীফা আরেকটা অদ্ভুত কাজ করল। একটা চিঠি লিখল।

-ওহে ভবিষ্যত শাহজাদা!

হ্যাঁ, আপনাকে বলছি। আপনাকে আমি এখনো চিনি না। কিন্তু হায়াতে থাকলে এক সময় তো আপনাকে আমি চিনবো। আপনি আমাকে চিনবেন। আমাদের দেখা হবে। কথা হবে। ....

-প্রিয় স্বামী আমার, হ্যাঁ স্বামীই বলছি। আমি আজ একটা অপ্রীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি। আমি আমার রবের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলাম, আপনার জন্য যে আমানত তিনি আমাকে (আপনার অনুপুস্থিতিতে) হেফাজতে রাখার জন্য দিয়েছেন, সেই আমানতের একটা অংশ (হাত), আজ একজন বেগানা মানুষ দেখে ফেলেছে। আমি জানি এই অধিকার আপনি ছাড়া আর কারও নেই।

-ওগো! বিশ্বাস করুন, এটা এবারই প্রথম ঘটল আমার জীবনে। আমাকে আপনি নিজ গুণে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন বলে আশা রাখি। অসুস্থতা না হলে এমনটা ঘটতো না। আমার আরোগ্যের জন্য দু'আ করবেন। আমি জানি আমার এই কথা আপনার কাছে এখন পৌঁছবে না। কিন্তু আমি তো আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সব সময় দু'আ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনিও আমার জন্য সবসময় দু'আ করেন।

-পরিশেষে, আমি বলছি, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন স্বামী আমার! আমি আমার ওয়াদার উপর অটল থাকব, আমাদের দেখা হওয়া পর্যন্ত। ইনশাআল্লাহ।

ইতি

আপনার.............

আফীফা চিঠিটা ভাঁজ করে তার টাকা জমানোর মাটির ব্যাংকে রেখে দিল।

জীবন জাগার গল্প: ৬১৮

অল্পবিদ্যা ভয়ংকর!

অনেক দাওয়াত দেয়ার পর, একজন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে সম্মত হল। সহকর্মীরা বেজায় খুশি। যাক, তারাও দায়ী বনে গেছে। নতুন ভাইকে সবাই পরম আদরে বুকের সাথে লাগালো। নাস্তাপানি করতে দিল।

✍

খাওয়া-দাওয়া চলছে, একজন চট করে বলল,

-এই রে! আসল কাজই হয়নি!

-কী কাজ?

-এ ভাইয়ের তো খতনা করানো হয়নি!

-হাঁ হাঁ, তাই তো!

নতুন ভাইটি বলল,

-খতনা কী জিনিস রে ভাই?

-এই ধরো তোমার 'ইয়ে'-র আগা থেকে সামান্য কেটে ফেলা হবে!

-কীহ! এটা করতেই হবে? না করলে হয় না?

-না, এটা হলো মুসলিম অমুসলিমের পার্থক্যরেখা!

-না ভাইয়েরা! আমাকে মাফ করো। যে ধর্ম গ্রহণ করতে না করতেই আমার 'ইয়ে' কেটে ফেলতে চাইছে, না জানি ভবিষ্যতে আরও কত কী কাটবে! আমি তবে আগের ধর্মে ফিরে যাই!

-সব্বোনাশ! তাহলে তো তুমি মুরতাদ! তোমাকে হত্যা করা তখন ওয়াজিব হয়ে যাবে!

-ওরে বাবারে! কী ধর্মের পাল্লায় পড়লাম রে! গ্রহণ করলে 'ইয়ে' কেটে ফেলে, আবার ছেড়ে দিলে গলা কেটে ফেলে!

একথা বলেই লোকটা বেহুঁশ হয়ে পড়লো।

✍✍✍

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) এর একটা উক্তি আছে। তার সারাংশ বোধ হয় এমন,

-তোমরা যদি, মানুষের জ্ঞান ও বুঝশক্তির বাইরে কোন কথা বলো সেখানে ফিতনা সৃষ্টি হবেই হবে।

✍

কিছু অজ্ঞ লোকের কারণেই আজ ইসলাম অন্যদের সামনে ভিন্নরূপে উপস্থাপিত। ইসলাম সম্পর্কে ভালভাবে না জেনে, মানুষকে দ্বীনের কথা বলতে গেলেই বিপদ। ফিতনা।

সমাপ্ত। আলহামদু লিল্লাহ।

জীবন জাগার গল্প সিরিজ

১. আকাশের ঝিকিমিকি তারা
মুদ্রিত মূল্য : ১২০

২. জীবনের ক্যানভাসে আঁকা গল্প
মুদ্রিত মূল্য : ১৪০

৩. থোকায় থোকায় জোনাক জ্বলে
মুদ্রিত মূল্য : ১৪০

৪. আমি যদি পাখি হতাম
মুদ্রিত মূল্য : ১২০

৫. গল্পের ক্যানভাসে আঁকা জীবন
মুদ্রিত মূল্য : ১৬০

৬. দু'জন দু'জনার
মুদ্রিত মূল্য : ১২০

৭. হুদহুদের দৃষ্টিপাত
মুদ্রিত মূল্য : ১০০

৮. কোঁচড় ভরা 'মান্না'
মুদ্রিত মূল্য : ১২০

৯. গুরফাতাম মিন হায়াত
মুদ্রিত মূল্য : ১২০